এখনো শিউলি ঝরে

শ্রীপারাবত

রেণুকা
৫, নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯
পরিবেশক : এস. চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশক : সুব্রত বসু
'সুইট হোম' পূর্ব কোদালিয়া
নব বারাকপুর, উত্তর ২৪-পরগণা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৬১

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

মুদ্রক : দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
৪/১ই বিডন রো,
এবং
জয়শ্রী প্রেস
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

এখনো শিউলি ঝরে

রেণুকা'র প্রকাশিত বই

নীল দরিয়ার আতঙ্ক

সম্পাদনা : অসিত সরকার

হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'লোলা গ্রেগ'

অনুবাদ : অসিত সরকার

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

সম্পাদনা : অসিত সরকার

একমুঠো ভালোবাসা

অনুবাদ : অসিত সরকার

কিউবার কবিতা সংকলন

অনুবাদ : আসত সরকার

রুথ এবং অন্যান্য গল্প

দিব্যেন্দু পালিত

দারুব্রহ্মকথা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অদ্বৈতবিজয়
শক্তিবিজয়
ত্যাজ্যপুত্র—অব্রাহ্মণ
রমণীর পাণিগ্রহণ
রণবিজয়
চণ্ডীবিজয়
(বংশ তালিকা দেওয়া
হলো না)
হেমন্তবিজয়
ইন্দ্রবিজয়
বসন্তবিজয়
দিগন্তবিজয়
ধর্মবিজয়
মধুবিজয়
(বংশতালিকা দেওয়া
হলো না)
সংগ্রামবিজয়
চন্দ্রবিজয়
(নিঃসন্তান)
(স্ত্রী চপলাসুন্দরী)
অনন্তবিজয়
ত্রিলোকবিজয়
ত্রিদীপবিজয়
জয়ন্তবিজয়
সমরবিজয়
প্রশান্তবিজয়
পৃথ্বীবিজয়
আকাশবিজয়
শকুন্তলা
অরণ্যবিজয়
আনন্দবিজয়
সত্যবিজয়
বিক্রমবিজয়
দিগ্বিজয়
কল্যাণী
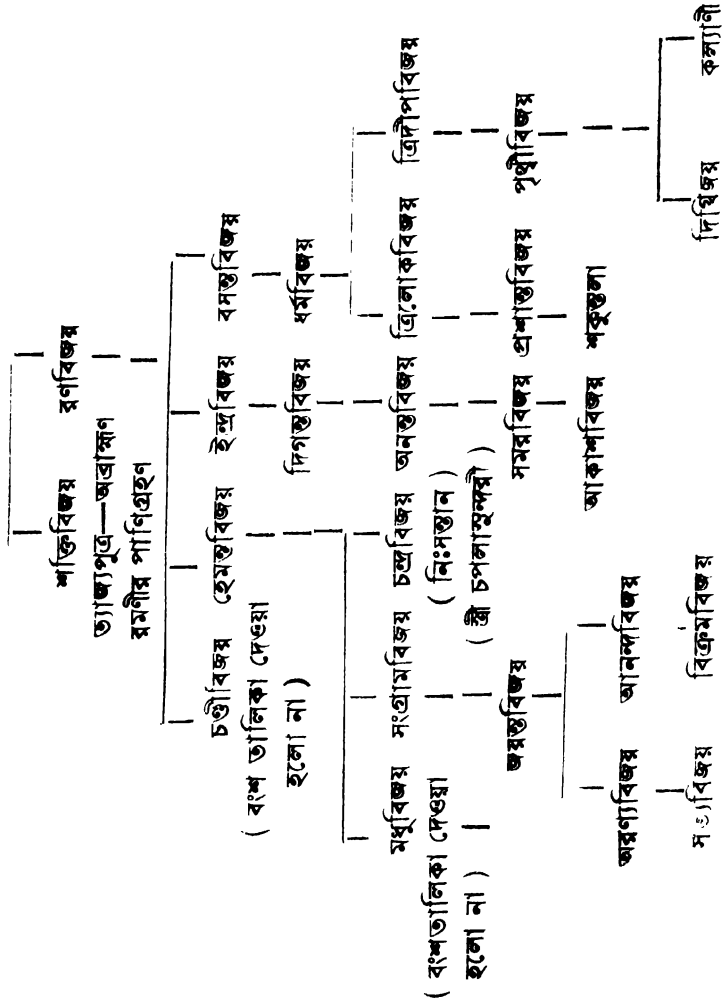
: উৎসর্গ :

মেজকাকামাকে

লেখকের কয়েকটি উপন্যাস

বাহাদুর শাহ

আরাবল্লী থেকে আগ্রা

সেফ ল্যাণ্ডিং

তখন ওয়ারেন হেস্টিংস

লাভার্স লেন

এম. এল. পম্পা

মমতাজ-দুহিতা-জাহানারা

বিনোদিনী

ও অন্যান্য

এখনো একটু অবশিষ্ট রয়েছে। বাঙালিপনা হারিয়ে গেলেও বাঙালিয়ানা রয়েছে কোথাও কোথাও। শ্যাওলার মতো এক চিলতে তৃণাচ্ছাদন কলকাতার পাড়ার মধ্যে দেখতে পেলে এখনো বিস্ফারিত দৃষ্টি বিস্ময় উপচে পড়ে না—এখনো নয়। ডিজেল ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় পোড়-খাওয়া রুগ্ন এক শিউলি গাছের অনাহার-ক্লিষ্ট যৌবনের একটা দুটো ফুল আপনার চলার পথে ঝরে পড়লেও পড়তে পারে যেমন, —এখনো। হ্যাঁ এখনো। তেমনি বহুতল বাড়ি আর নানান ভাঙচুরের ভেতরে আনাচে কানাচে এই খাঁজ ওই খাঁজের মধ্যে কুনো ব্যাঙের মতো সেই কিছুটা নিম্নমধ্যবিত্তের বাঙালিয়ানা দ্রুত নিঃশেষের পথেও এখনো টিমটিম করছে। আর পাঁচ দশ বছর পরে সবই একাকার হয়ে যাবে—যেমন ছোটবড় খানাখন্দ বৃষ্টি আর বন্যার জলে একাকার হয়ে যায়। সেখানে সব সমান। শহরে এক জাতি—নাম তার মানব জাতি। তাদের শিক্ষা কি? জানি না। সংস্কৃতি? জানি না। কী ভাষায় কথা বলে? কেন, যে ভাষায় তাড়াতাড়ি কাজ গোছানো যায়। লোকে বলে তাদের দর্শন রয়েছে একটা। তবে সে দর্শনে, সে শিক্ষায় আর সেই রুচিতে সেকালের সময়-অপচয়কারী সূক্ষ্মতা নেই। কেন থাকবে? নক্‌শী কাঁথা মিউজিয়ামে রাখতে পারেন। তাই বলে বসে বসে তৈরি করবে কোন আহাম্মুক? আগেকার দিনের সিনেট হল, অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল? উঠল তো বাক্স-বাড়ি।

ভাতে-পুঁই-এর বাঙালীর সূক্ষ্মতা মজ্জাগত। যার ফলে টাল সামলাতে না পেরে শহর থেকে কেটে পড়ছে দূরে—ক্রমশ আরও দূরে। তাই যেটুকু আছে, সেদিকে বড় বেশি দৃষ্টি যায়। দেখে কেমন একটা লজ্জা লজ্জা ভাব হয় কি? লোকে কি ভাবে, এই সব দেখে? এই সেকেলে বাড়ি, এই সেকেলে আবেষ্টনী, এসব দেখে

শহরের আধুনিক লোকেরা মনে মনে কত হাসে। ভাবে, বাঙালীরা এক অদ্ভুত জীব। সাহেবদের মোসাহেবি করে বেশ উঠেছিল একদিন। ভাগ্যিস পলাশী নামক ময়দান আর আম্রকানন কুরুক্ষেত্র কিংবা পানিপথে ছিল না। নইলে এই লিকলিকে পায়ের তেল চিকচিকে রোগা রোগা চেহারার মানুষগুলোকে হটিয়ে দিতে ভারত স্বাধীন হবার জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। ওদের নিঃশেষ করতে কলিঙ্গ যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না। ওদের অস্তিত্বহানি ঘটাতে মোটা কথাবার্তা আর ফ্রি-স্টাইল কুস্তির মতো কিছু বিধিসম্মত বে-আইনী মারপ্যাঁচই যথেষ্ট। অভিমানে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে ফুটতে অতীতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা ভাবতে ভাবতে ওরা পশ্চাদপসরণ করবে।

তবু পথের সামনে শিউলি ফুল টুপ্‌ করে ঝরে পড়লে পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। তেমনি ঝরে পড়া বাঙালিয়ানার একটু স্পর্শ এখনো যেখানে, সেখানে ছদণ্ড থমকে দাঁড়াতে হয় বলেই অতবড় অভ্রংলিহ আট্টালিকার অপরাহ্ণের ছায়া যেখানে শেষ হবো হবো সেখানে ওই নাম করা কোনো অতীতের পায়রা আর খঞ্জন পাখি ওড়ানো বাঙালী বাবুর ভগ্ন প্রাসাদটিকে অবহেলা করতে বাধে। একটা মায়া—অন্তরের টান। প্রাসাদের কোথাও ঝিনুক, কোথাও রঙিন কাঁচের কারুকার্যের খানিক এখনো অস্পষ্ট ধরা পড়ে —যেমন নজর এড়ায় না সেই কবেকার পারদ অ্যালকহল এবং সুখাদ্য মিশ্রিত রক্তের ধারা বহনকারী এ বাড়ির এই জীবগুলোর চেহারার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সবার সঙ্গে ঠিক যেন মেলে না। সাদামাটা ভাব অনেকটাই অনুপস্থিত এদের চেহারায়। কথাবার্তা অবয়ব আর চেহারায় স্পষ্ট সূক্ষ্মতার ছাপ। স্থূলতার স্পর্শটুকুও নেই। এই বাড়ির গণ্ডীর মধ্যে না দেখলে অবশ্য ওই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার বিন্দুমাত্র কারণ থাকে না। পথে ঘাটে অমন কত হার্মাদ মগ মুঘল এ্যাংলো স্যাক্সনের শোণিত বহনকারীকে মানুষ নিত্য দেখে। অনেকটা রোগের বীজাণুবহনকারী কীটপতঙ্গের মতো দিব্যি সবার সঙ্গে গা মিলিয়ে জনতা হয়ে থাকে তারা। আলাদা করে বেছে নেওয়া যায়

না। যদি না তাদের কারও কারও মধ্যে দুশো তিনশো বছরের আগের নির্ভেজাল উগ্রতা অদ্ভুতভাবে হঠাৎ প্রকট না হয়ে পড়ে।

ওদের ওই ভাঙাচোরা বাড়ির চোখা চোখা ফর্সা ফর্সা মানুষগুলোর সঙ্গে উঠোনের নারকেল কুল গাছটারও কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে। পুরীব বকুল গাছের মতো এঁকে বেঁকে উঠে মাথার ওপর বেশ একটা ছাতা বিস্তার করেছে। দুচারটে কুলও ফলে এবং সরস্বতী পুজোর দিন এ-বছর অবধি ঠাকুরের সেবায় লেগেছে। তবে যে-বুড়ি, হাড়হাভাতে উড়নচণ্ডী ছেলেমেয়েদের নেকনজর থেকে ফলগুলোকে এতদিন আগলে রাখত, সে চোখ বুঁজেছে এবারের মাঘের শীতের শেষ কামড়ে তিরানব্বই বছর বয়সে। সে নাকি আট বছর বয়সে নাকে নোলক পরে এ বাড়িতে পদার্পণ করেছিল—জীবনে আর বাপের বাড়ির মুখ দেখেনি। না দেখাব মূলে তার স্বামীর তীব্র আভিজাত্য-বোধ আব ক্রোধ। প্রিন্স দ্বাবকনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ বন্ধুব প্রপৌত্র সে। আর তার বাবা কিনা তেমন খোঁজখবর না নিয়ে শুধু ঝাঁপির মতো ছোটখাটো পরমাসুন্দরী কন্যা দেখেই তার গলায় ঝুলিয়ে দিল? জাত কুল মোটামুটি ভাল হলে কি হবে? পেছনের ইতিহাসটুকু জানার প্রয়োজন বোধ করল না একবারও? অবশ্য, বুড়ির ভুবন ভোলানো রূপ দেখে সেও যে বিহ্বল হয়নি তা নয়। নইলে চপলাসুন্দরীকে পঁচাশি বছব এবাড়িতে বসবাস কবে দেহ রাখতে হতো না। যেদিন ভেতরের খবব জানা গেল সেদিনই শ্বশুববাড়ির পাট চুকতো বালিকা বধূর।

আসল ঘটনা হলো, চপলাসুন্দরীর বাবার এক বন্ধু ছিল একই গ্রামে। দুজনাই মৃতদার। অথচ দুজনারই একটি করে কন্যা। সমাজ বড় কঠিন ঠাঁই ছিল সে সময়ে। দুজনারই কন্যার অরক্ষণীয়া হবার বয়স ছুঁই ছুঁই। মাথা কুটেও পাত্র যোগাড় করতে পারছিল না তারা। কুলীন বংশ দুজনারই। পাত্র পাওয়া কি সহজ কথা? শেষে একদিন দুজনার মাথায় চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। এতদিন দুজনা ছিল শুধু বন্ধু। একদিন ফাল্গুনের এক শুভলগ্নে উভয়ে হয়ে

গেল একাধারে উভয়ের শ্বশুর ও জামাতা। দুজনা দুজনার মেয়েকে বিয়ে করে বসল। চপলাসুন্দরী সেই বিবাহেরই একমাত্র ফসল। তার স্বামী ঠিকই করেছে। অমন বাপের বাড়িতে মরতেও যায় না কেউ। স্বামীর প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন ছিল। বিয়ের আগে তার মাথায় অতশত ঢোকেনি। ঢুকলে, গলায় কলসী বেঁধে কবে রূপনারাণে ডুবে মরত। এ গল্প করার সময় কিন্তু বুড়ি ফোকলা দাঁতে ফিক্‌ফিক্ করে হাসত। বলতও বেশ রসিয়ে বসিয়ে—যেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য পড়ছে। বয়সটা তার এমন পর্যায়ে এসেছিল যে অতীতের ঘটনা শুধু ঘটনাই—তাপ ছিল না কিছুমাত্র। যেন অনেক উঁচু পাহাড়ের চুড়ায় দাঁড়িয়ে নীচের জগতটাকে দেখত সক্রেটিসের দৃষ্টিতে।

চপলাসুন্দরীর মৃত্যুর পরই এ বাড়ির মানুষেরা যেন প্রথম আজকের কলকাতার মুখোমুখি হলো। কেমন একটা অসহায়তা তাদের মনের আনাচে কানাচে। চপলার মুখে গিরিশ ঘোষ আর দানীবাবুর অভিনয়ের কথা শুনতে শুনতে, জেলেপাড়ার সঙ্‌-এর ইতিবৃত্ত জানতে জানতে তাদের খেয়াল হয়নি, পাশের ওই মেঘে ফুঁড়ে ওঠা বিরাট বাড়িটার জানালাগুলোর বাইরে যে সব বাক্স বসানো রয়েছে সেগুলো ঘরের ভেতরটা শীতল রাখে। তাদের বাড়ির হলঘরটায় সেই টানা পাখার যে ফ্রেমটা অস্তিত্ব বজার রেখেছে তারই গর্বে বুঁদ হয়ে বসেছিল এতদিন। অথচ যুগটা কত এগিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

এই মুখোপাধ্যায় বংশ সেই আগেকার হাড়পাঁজরা বার করা বাড়ি, ঝোপজঙ্গলে ঢাকা পুরোনো ঠাকুরদালান, নারকেল কুলের গাছ, দুটো লম্বা সিড়িঙ্গে নারকেল গাছ, একটা শিউলি আর একটা চাঁপা গাছ নিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। এই অস্তিত্বের ওপর আঘাত আসছে বারবার—নড়বড়ে কুঁড়েঘর দেখে গাঁ-গঞ্জের ঝড় যেমন আছড়ে পড়ে বেছে বেছে তারই ওপর—ঠিক তেমনি।

ভাগ্যক্রমে এই বংশেরই কেউ কেউ নিজ নিজ মাতুল বংশের অর্বাচীন শিল্প সংস্কৃতির রক্ত সংমিশ্রণের প্রভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছে। একজন তো বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের 'কুহকিনী কোর্টের' দুখানা

ফ্ল্যাটই কিনে ফেলেছে। চপলাসুন্দরীর তাদের ওপর কোনো বিরূপ মনোভাব ছিল না। কিন্তু এ বাড়ির গর্বিত বংশধরেরা তাদের দুয়ো দেয় বারবার। এ-বংশে জন্মগ্রহন করে চামড়ার ব্যবসায় বড়লোক হবার কথা কল্পনা করা যায়? এরা বলাবলি করে কুহকিনী কোর্টের সত্যবিজয় মুখোপাধ্যায়ের উচিত তার পদবী পালটে ফেলা। চপলা-সুন্দরী শুনে হেসেছে—যেমন হাসত তার বাবা আর বাবার শ্বশুর-মশায়ের গল্প বলতে বলতে। হেসেছে আর বলেছে—যে সময়ের যা। সতু চামড়ার ব্যবসা করে তো কী হয়েছে? তোরা প্রিন্স দ্বারিকের কথা বলিস। তিনি কত কি ব্যবসা করতেন আর ফেল হতেন! তিনি তো সাহেব ছিলেন—জাত গিয়েছে?

শুধু সত্যবিজয় মুখোপাধ্যায় নয়, আরও অনেকে সরে পড়েছে। তবে তাদের কীর্তিকাহিনী অমন চমকপ্রদ নয়। তারা জীবনের ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই বিদায় নিয়েছে। ভাগের একটি ঘরে স্ত্রী আর তিন চারটি সন্তানকে নিয়ে বাস করা অসম্ভব বলেই তারা এ-বাড়ি ছেড়েছে নিজেদের গরজেই। কোথায় মিলিয়ে গেল তারা কেউ জানে না। দু একজনের সঙ্গে অবশ্যঃকলকাতার পথে ঘাটে আচম্বিতে দেখা হয়ে গিয়েছে এ-বাড়ির কারও। কোথায় থাকে বলতে চায়নি। চেহারা আর পোশাক-আশাক দেখে আগ্রহভরে ঠিকানা জানার স্পৃহা জাগেনি। শুধু বিদায় নেবার সময় চপলা-সুন্দরীর খোঁজটুকু নিতে ভোলেনি কেউ।

এই চপলাসুন্দরীই একদিন খবরের কাগজের সিনেমার পাতায় বম্বের এক নায়িকার চেহারায় বিক্রমবিজয় মুখোপাধ্যায়ের মিল খুঁজে পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য হয়নি কোনো। ব্যর্থ বিক্রমবিজয় এবং তার স্ত্রী দুই মেয়ে সোহাগী আর মদালসাকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল চিরদিনের মতো। সিঁড়ির নিচের যে ঘরখানায় তার অধিকার বর্তেছিল সেটি বড় ছোট। স্থান সঙ্কুলান হতো না। সিনেমার নায়িকার ছবি দেখে বুড়ি চপলাসুন্দরী বিড়বিড় করে বলেছিল, এ বাড়িতে একবার

দানীবাবু এসেছিলেন। বাড়ির মেজকর্তা ছোটবেলায় খুব ভাল অভিনয় করতেন। দানীবাবু কতবার তাঁকে থ্যাটারে নামাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাই কি হয়? শহরের এত লোকের সামনে নষ্ট মেয়েছেলেদের সঙ্গে রঙ-তামাসা করবে এই বংশের সন্তান? ঢি ঢি পড়ে যাবে যে। ও-সবের জন্যে তো বেহালার বাগান বাড়িই রয়েছে। আর শরীর অসুস্থ হলে ওই তো বাগানের মধ্যে মাটির নিচের ঘর—যে ঘরে দিগ্বিজয় পুলিশের গুলি খেয়ে মরল।

এখন এ-বাড়িতে রয়েছে চার পিতার উত্তরপুরুষ এবং তাদের সন্তানসন্ততি। অনেকে চলে যাবার পর এখন বাড়ির সেই নিত্য-হাটের আবহাওয়া আর নেই। কারণ এখনকার সবারই একটি দুটি করে ছেলেমেয়ে। এখন চার কর্তার নাম অনন্তবিজয়, পৃথ্বীবিজয়, অমরবিজয় আর প্রশান্তবিজয়। অনন্তবিজয় প্রৌঢ়ত্ব শেষ করে বার্ধক্যে পা দিয়েছে বেশ কিছুদিন। অমরবিজয় পৃথ্বীবিজয় আর প্রশান্তবিজয়, তিনজনাই সম্পর্কে অনন্তবিজয়ের খুড়তুত দাদাদের সন্তান। দাদাদের পিতামহ আর অনন্তবিজয়ের পিতামহ আপন ভাই। দাদারা অল্পবয়সে বংশ-রক্ষা করে স্ত্রীদের প্রায় সঙ্গে করে নিয়েই পৃথিবী ত্যাগ করেছে। সবাই মানুষ হয়েছে চপলাসুন্দরীর তত্ত্বাবধানে। চপলাসুন্দরী অনন্তবিজয়ের জ্যেঠামশায়ের নিঃসন্তান সহধর্মিণী।

একটা কথা চপলাসুন্দরীকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত। বলত, নয় পুরুষের পর এই বংশ শেষ হয়ে যাবে। তেমন-ই নাকি বিধাতার বিধান। কেন যে এই বিধান, কেউ জানে না। চপলাসুন্দরীও শুনেছিল তার শাশুড়ীর কাছে। তিনিও নাকি শুনেছিলেন তাঁর শাশুড়ীর কাছে। অদ্বৈতবিজয়ের পরে নয় পুরুষ। তা, লক্ষণ দেখে তাই মনে হয় বটে। পুত্রের সংখ্যা কমে গিয়ে কন্যার সংখ্যা বেড়ে চলেছে তিন পুরুষ ধরে। কেউ কেউ আবার নিঃসন্তান।

কলকাতায় এখনো সত্যিই শিউলি ফোটে। ঝরেও পড়ে। তেমনি আকাশবিজয়ের ছোট্ট ঘরের পাশের চাঁপা গাছেও ফুল

ফোটে। সেই ফুল সে একটি ছুটি করে তুলে এনে তার টেবিলে একটি ডিশের ওপর রেখে দেয়। এই বংশের এককালের বিরাট বিপুল শৌখিনতার মৃত্যুস্পর্শ সে পেয়েছে। সে-ই এ-বাড়ির সর্বশেষ পুরুষ বংশধর আপাতদৃষ্টিতে। আশেপাশের আর সবাই মেয়ে। আর একজন ছিল। সে হলো দিগ্বিজয়। পৃথ্বীবিজয়ের ছেলে। দিগ্বিজয় তার আদর্শ পুরুষ। তার একটা ছোট ফটো বাঁধিয়ে সে টেবিলে রেখেছে। দাদু অনন্তবিজয় একদিন ওপর থেকে নিচে নেমে এই ঘরে ঢুকে ফটো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বকেছিল খুব। সে নিষেধ মানেনি। তার বাবা, অনন্তবিজয়ের একমাত্র সন্তান, সমরবিজয়, তার জন্মের কয়েক বছর পরেই ইহলোক ছাড়ে। তার বাবা আবার ছিল দিগ্বিজয়ের আদর্শ পুরুষ। এ বংশে জন্মগ্রহণ করেও সমরবিজয় এরিয়ান্সের মতো ক্লাবের নিয়মিত ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। ক্লাবের সঙ্গে রাণাঘাটে খেলতে গিয়ে ফেরার পথে উল্টোডাঙা স্টেশনের কাছে কেষ্টপুর খালের ব্রীজের থামে ধাক্কা খেয়ে তার দেহ গিয়ে পড়ে খালের জলে। মাথার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তবু মরে গেলেও এ-বাড়িতে সে একটা ঝোড়ো হাওয়া বইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। যার ফলে দিগ্বিজয়ের আবির্ভাব। এ-কথা দিগ্বিজয় কতবার বলেছে আকাশকে। তার ছবি কি দাদুর ধমকে সরিয়ে রাখা যায়? চাঁপাফুলগুলো যতদিন ধরে ফুটতে থাকে মনে মনে সে দিগ্বিজয়ের চরণেই অর্পণ করে ততদিন।

বাড়িতে এককালে কত বড় বড় আসবাবপত্র ছিল। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা প্রকাণ্ড পালঙ্ক ঘরের মধ্যিখানে। বড় বড় আবলুশ কাঠের আয়না লাগানো আলমারি। তাতে আবার দেরাজ। আকাশের সবকিছু দেখার সৌভাগ্য হয়নি। অবশিষ্ট যা ছিল তার একটিকে আকাশ দেখেছে চিন্তাহরণ ঘোষের ছেলে লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে যেতে। সেটি একটি কারুকার্য করা আয়না। প্রশান্তবিজয়ের ঘরে ছিল।

অনন্তবিজয় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশান্তবিজয়কে বলেছিল—ওটি শেষে

ওই ঘোষের পোকে বিক্রি না করলেই কি হতো না?

লক্ষ্মী ভাল দাম দিয়েছে।

তাই বলে ওকে?

আমার টাকার দরকার কাকা। দেখলেই তো পুজোর মধ্যে কীরকম বর্ষা নামলো এবারে। বাইরে গেলাম কোথায়? সব কণ্ট্রাক্ট বাতিল করে দিল কোম্পানী।

প্রশান্তবিজয় যাত্রাদলের নায়ক। নামভূমিকায় অভিনয় করে এই বয়সেও। বুঝতে পারা যায় দানীবাবু তার পূর্বপুরুষকে শুধু শুধু চেহারা দেখে রঙ্গমঞ্চে নামাতে চাননি। অভিনয় প্রতিভারও আভাষ পেয়েছিলেন। অথচ বাধ্য হয়ে যখন প্রশান্ত যাত্রা দলে নাম লেখালো তখন ওই চপলাসুন্দরীই নাকি তিন দিন জলস্পর্শ করেনি।

টাকা তো কম রোজগার করো না প্রশান্ত। একটু রয়ে সয়ে—

এর বেশি বলা অনন্তবিজয়ের পক্ষে শোভা পায় না। একে তো দিন নেই রাত নেই এক মুলুক থেকে আর এক মুলুকে যাত্রার আসর বসার জন্য ছোটাছুটি, তার ওপর সেই কবেকার পূর্বপুরুষের রক্তকণিকাবৃন্দ কাঁচা টাকার স্বাদ পেলেই কিসের আশায় যেন বৃন্দনৃত্য শুরু করে ধমনীর অভ্যন্তরে। খরচা বেশি হবেই।

তবু অনন্তবিজয় শ্রদ্ধার পাত্র। তাই প্রশান্তবিজয় রেখে ঢেকে বলে—চেষ্টা করি, পারি না।

এই আয়নাটাই ছিল এ-বাড়ির শেষ দর্শনীয় বস্তু। আর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট রইল না।

মৃত দিগ্বিজয়ের ছোট বোন কল্যাণী মুখে আঙুল দিয়ে সব কথা গিলছিল। বয়স তখন তার ছিল তেরো। অনন্তবিজয়ের মুখে বড় বেশি ব্যথার প্রকাশ দেখতে পেয়ে সে বলে—না দাদু। আর একটা আছে।

কি?

ওই যে টানা পাখার ফ্রেম? ওটা কেউ কিনবে না। কেউ বেচতেও পারবে না। ওটা তো সবার। হল ঘরের ভেতর যে।

কল্যাণীর কথায় প্রশান্ত খুব লজ্জা পেয়ে যায়। সে বলে,—জানি, দোষ করলাম। তবু, অনেক চেষ্টা করেও ঘরে রাখতে পারলাম না। সত্যবিজয়কে ফোন করে একদিন বাজিয়ে দেখেছিলাম, ঘরের জিনিস ঘরে রাখার চেষ্টায়। সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সীতা হরণের সময় রাবণের হাসির মতো।

অনন্তবিজয় ঘৃণার সঙ্গে কাটা কাটা ভাবে বলে—এখন দেখগে আশোকবনের সীতার মতো কেউ ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে কিনা তোমার ঘরে।

কথাটা অনন্তবিজয় বলেছিল প্রশান্তর স্ত্রীর কথা ভাবে। বিয়ের সময় প্রশান্তর স্ত্রীর একটা স্বপ্ন ছিল। প্রশান্ত সামান্য চাকরি করত বালিতে। তবু প্রাণোচ্ছল ছিল বধূটি। চাকরি সামান্য হলে কি হবে, বংশ তো বলতে গেলে রাজার বংশ। কিন্তু স্বামী যাত্রায় যোগ দেবার পরই হঠাৎ যেন নিভে গেল। যেন মুহূর্তের মধ্যে এতদিনের আসল রাজা নকল রাজায় পরিণত হলো।

চিন্তাহরণের ছেলে লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ কুলির মাথায় আয়না চাপিয়ে নত হয়ে প্রশান্তবিজয়ের পদধূলি নিয়ে বিদায় নিয়েছিল। এত ভদ্র যে মানুষটি, তার ছেলে অচ্যুতের সঙ্গে আকাশবিজয় অল্পবয়সে যখন খেলা করত তখন অনেক চাপা ধমক তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সে এর অর্থোদ্ধার করতে না পেরে ভ্যাবাচাকা খেত। অতবড় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর ছেলে এ-বাড়িতে এত অনভিপ্রেত কেন? একদিন অচ্যুতের জন্মদিনে ভরপেট মিষ্টি খেয়ে এসে যখন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করছিল, তখন আসল অর্থ ভব্যতার আড়াল থেকে বার হয়ে দাঁত বার করে। অচ্যুতের পূর্বপুরুষ বংশানুক্রমে এ-বাড়ির গোশালার অধিকর্তা ছিল। গোশালা একটা ছিল বটে। সি. আই. টি রোড এখন তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। এই গোশালার বিরাট এলাকা প্রকৃতপক্ষে চওড়া রাস্তার ওপর তাদের ভদ্রাসনটুকু রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। নইলে এ-রাস্তার পাশে বাড়ি রাখার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

কথাটা জানার পরও অচ্যুতের সঙ্গে আকাশের বিচ্ছেদ ঘটেনি বটে। কিন্তু সেই সহজ ভাব সে কিছুতেই আর ফিরে পায়নি। তবে অচ্যুত কখনো কোনোরকম সন্দেহ করতে পারেনি। সে ভাবতেও পারেনি আকাশের চোখের সামনে তারই কোনো কল্পিত পূর্ব-পুরুষের দুধের ভাঁড় হাতে মূর্তি মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। আকাশ মর্মে মর্মে বুঝতে পারে সমাজের প্রথাগুলো কত বিষাক্ত সংস্কার আর অহঙ্কারের নাগপাশে আবদ্ধ।

আকাশবিজয় ভালভাবে জানে অতীতের গৌরব আর বংশ-পরিচয়ের পাত্র ধুয়ে ধুয়ে পিতামহ প্রপিতামহ অনেক জল খেয়েছেন। ধুয়ে ধুয়ে গৌরব সাফ হয়ে গিয়েছে—যেমন হয়েছে বাড়ির ইঁটের পলেস্তারা। এত বেশি ক্ষয়ে গিয়েছে যে এখানে ওখানে খসে পড়ছে। সুতরাং তাদের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। কিংবা সত্যবিজয়ের মতো একটা নতুন দিগন্তের সন্ধানে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চিন্তা এক জিনিস আর কাজে পরিণত করা আর এক জিনিস। সেই কাজের পথে বাধা, তাদের কয়েক পুরুষের আলস্য আর বিলাসিতা, সংস্কার আর লজ্জা, ভুয়ো আত্মসম্মানবোধ আর ফাঁকা গর্ব। এর যে কোনো একটা তাকে কিছুতেই উঠতে দেবে না, এ বিষয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। তাই আগে থেকেই পরাজিতের মনোভাব। সে জানে, তার দাদু অনন্তবিজয়ের মনের মধ্যেও বিদ্রোহ ভাব রয়েছে। মাঝে মাঝে কী যেন করতে চায়—একটা নতুন কিছু—এ বংশে যা বেশ বিপ্লবাত্মক। তখন ঘনঘন পায়চারি শুরু করে অনন্তবিজয়। শেষে সন্ধ্যা হতে না হতেই এক ডেলা আফিম মুখে ফেলে বিপ্লবের ওপর জল ঢেলে দেয়। তবু ওই বিপ্লবটুকু দাদুর মধ্যে ছিল বলেই আকাশবিজয়ের বাবা বোধহয় এরিয়ান্সের খেলোয়াড় হতে পেরেছিল। সুতরাং তার কাছে এ-বংশের প্রত্যাশা হয়তো আরও একটু বেশি। দিগ্বিজয়ের মতো অমন চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটাতে না পারলেও কিছু তো সে করতে পারে।

দিগ্বিজয় যে একটা কিছু করত আকাশবিজয় আন্দাজ করতে

পারত। কিন্তু সে যে ঐ রকম রাজনীতি করত এ-কথা কল্পনাতেও আসেনি তার। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, তাদের বাগানের মাটির নিচের ঘরটি ছিল ওদের অস্ত্রাগার। সেখানে রাত বারোটা থেকে ভোর চারটে, টানা চার ঘণ্টা লড়াই চালিয়ে একজন পুলিশকে মেরে ফেলে, আর একজনকে ঘায়েল করে, তবে সে আর তার দুই সঙ্গী মারা যায়। পুলিশের অনুরোধে অনন্তবিজয়, প্রশান্তবিজয় এমনকি অমরবিজয়ও দূর থেকে ব্যাটারি লাগানো লাউড স্পীকারে চেঁচিয়ে বলেছে আত্মসমর্পণ করতে—কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। শুধু দিগ্বিজয়ের বাবা পৃথ্বীবিজয় চোয়াল শক্ত করে ঠায় নিজের ঘরে বসেছিল। পুলিশের শত অনুরোধেও বাইরে আসেনি। বলেছিল, ও ওর নিজের পথে চলছে, আমি বাধা দেব কেন?

পরের দিন খবরের কাগজে দিগ্বিজয়ের ছবি বার হলো, বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে। আকাশ প্রথম জানলো দিগ্বিজয় একজন উঁচুদরের লীডার ছিল। আজও আকাশ অবাক হয়ে ভাবে, তার জানলা দিয়ে মাটির নিচের ঘরের ওপরেব অংশটি স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অথচ কখনো কোনো সন্দেহজনক কিছু তার কিংবা তার বাড়ির কারো চোখে কোনোদিন পড়েনি। হয়ত সেভাবে ওদিকে কেউ দৃষ্টি ফেলেনি। কারণ ওই ঘরখানা সম্বন্ধে বরাবর একটা আতঙ্ক ছিল এই পরিবারে। অনন্তবিজয়ের পিতামহ ইন্দ্রবিজয়ের মৃত্যু হয়েছিল ওই ঘরে মদের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে। কাছে সেই সময় কেউ ছিল না। হয়ত থাকত, যদি বয়স কম হতো, কিংবা থাকতো যদি আগের সেই রমরমা অবস্থা। আসলে ইন্দ্রবিজয়ের পর থেকেই এই মুখোপাধ্যায় বংশের সূর্য পশ্চিম দিকে একেবারে ঢলে পড়েছে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির মধ্যে বর্ধমানের বিরাট জমিদারির রাজস্ব সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা না দিয়ে নায়েব সব টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল কিছু না বলে। তার ওপর কলকাতার ব্যবসায়ে বড়রকমের ওলট পালট। বসে বসে মাটির নিচের ঘরে মদ খেত ইন্দ্রবিজয় একা একা। সেই অবস্থাতেই মৃত্যু। তারপর থেকে

ওখানে ভরদুপুরে কিংবা স্তব্ধ নিশীথে শিশি-বোতল নাড়াচাড়ার টুংটাং আওয়াজ নাকি এখনো শোনা যায়। চপলাসুন্দরীকে প্রশ্ন করা হলে বলত,—ও-কথা বলতে নেই। নায়েব বিপ্রদাস অধিকারী একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছিল। তা, তারও ভাল হয়নি বাপু। সমস্ত টাকা তার ডাকাতি হয়ে গেল। একটা হাতও খোয়া গেল। কাঁদতে কাঁদতে শেষে এ-বাড়িতেই এসেছিল আশ্রয়ের জন্য। সোঁদরবনের জমিদারির নায়েব হৃদয় হাজরা তখন এ-বাড়িতে। সে বিপ্রদাসের কান ধরে টেনে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

দিগ্বিজয় আকাশকে দু'একদিন ওই মাটির নিচের ঘরের দিকে নিয়ে গিয়েছে। বলেছে, বাগানের অতবড় ঘাসের মধ্যে সাপ রয়েছে কিনা কে জানে? সেই সময় ঘরটির কথা উল্লেখ করেছে আকাশ। দিগ্বিজয় বলেছে, ওইসব ভৌতিক আস্তানা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।

পুলিশ খবর পেল কি করে?

অচ্যুত বলে, নিশ্চয় পাশের ওই বিরাট বাড়িটার কেউ পুলিশকে খবর দিয়েছে। ওদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যে টেলিস্কোপ দিয়ে আশেপাশের বাড়িগুলোর অন্দরমহলে উঁকি দেয়। এমন বিকৃত স্বভাব অনেক পয়সাওলা মানুষেরই থাকে। এটাই তাদের বিলাস। সেই সময়ে দেখে ফেলে থাকবে। তারপর টেলিফোন তুলে সোজা লালবাজার।

হতে পারে। অচ্যুতের কথার ওপর আকাশবিজয়ের খুব আস্থা। সে ভাবের ঘোরে কথা বলে না। তার সব কথায় যুক্তি রয়েছে। তার মধ্যে আবেগ বলতে কিছু নেই। দৃষ্টিতেও নেই রঙ মেশানো। পৃথিবীকে ঠিক যেমন দেখতে, সে তেমনি দেখতে পায়। অতীতের ইতিহাস তার চিন্তা আর মতবাদের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। তাই সে কত সহজ। আকাশেরও হামেশা অমন হবার সাধ জাগে। সে জানে, এ-যুগের মাপ-কাঠিতে, তারা সাধারণ মানুষের চেয়েও

নিচে। তবু এ-বাড়ির সবার মধ্যে চপলাসুন্দরী কী যে ঢুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। ভাবতে শিখিয়েছে, ভিক্ষে করে খেতে হলেও তারা সাধারণ নয়। কী সাংঘাতিক প্রমাদ। সত্যবিজয় এবং আরও অনেকে এই প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে বেঁচে গিয়েছে। তারা কেউ ধনী কেউ নির্ধন। তবু তারা সব মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে। আর এ বাড়ির লোকেরা অশ্বত্থ গাছ গজানো, ঝিনুক ওঠা সরু ইটের চল্লিশ ইঞ্চি পুরু গাঁথনির ঠাণ্ডায় বসে এককালের ঝালর-লাগানো টানা পাখার অবশিষ্ট ফ্রেমটির দিকে চেয়ে অনন্তবিজয়ের মতো নেশায় বুঁদ হয়ে প্রিন্স দ্বারিকের যুগের স্বপ্ন দেখছে।

দিগ্বিজয়ের মৃত্যুর কয়েকদিন পরে প্রথমে আকাশেরই নজরে পড়েছিল ব্যাপারটা। অমরবিজয়ের কথাবার্তা আর চলন বলনে সামান্য একটু অসঙ্গতি। ছুটে গিয়ে অমরবিজয়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বড় কাকীমা, বড় কাকুর কি হয়েছে ?

কী আবার হবে ?

কথাবার্তা, কেমন করে বলছেন না ?

অতবড় শোক পেয়েছে, তাই বোধহয় অমন হয়েছে ? তোমার অত ব্যস্ত হবার কি আছে ? ঠিক হয়ে যাবে।

আকাশবিজয় বলতে পারেনা, জিনিষটা অত সহজ নয়। এটা রীতিমত মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ। কিন্তু বললে, কাকীমা আঘাত পাবে। সে ভেবেছিল, মরমী অন্তত বুঝবে। মরমীর বয়সও তারই মত। সে বুঝতে পারল, অথচ মরমী বুঝলো না ? আর কাকে বলবে ভেবে না পেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে গুটি গুটি অনন্ত বিজয়ের ঘরে গিয়ে ঢোকে। ঠিক সেই মুহূর্তে অনন্তবিজয় তার খাটের পাশে টেবিলের ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল। সেখানে রয়েছে আফিমের কৌটো। সাধারণতঃ তার আফিম সেবনের সময় আরও আধঘণ্টা পরে—ঠিক যে-সময় এককালে বাড়ির সামনে যে

গ্যাস লাইট ছিল, সেটি জ্বলিয়ে দিয়ে যেত। এখন অনেক আভি-জাত্যের সঙ্গে কলকাতার সন্ধ্যায় মায়াজাল বিস্তার-কারী সেই গ্যাস বাতি অদৃশ্য হয়ে ‘অতি প্রকট ইলেকট্রিক লাইট শোভা পায়। সে দেখেছে তার বাবা দিগন্তবিজয়ও গ্যাস-বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আফিমের বড়ি মুখে দিতেন। কিন্তু আজ একটু আগে কৌটোটির কথা মনে পড়ার কারণ সামনে খুলে রাখা পুরোনো “সংবাদ-প্রভাকরের” একটি পৃষ্ঠা। সেই পৃষ্ঠায় ১২৫৯ সালের ৩০শে ফাল্গুণের একটি সম্পাদকীয় পড়ছিল সে ঃ

“এ ভারতবর্ষ মধ্যে যত দেশ ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে এই বঙ্গরাজ্য অতি বিস্তীর্ণ, স্বাভাবিক নিয়মদ্বারা মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় সকলবস্তুই এখানে প্রচুর রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, একারণ এই দেশ অবনীর অন্যান্য জাতিদিগের প্রধান বাণিজ্য স্থল হইয়াছে……এখানকার বণিকেরা কোন ভিন্নদেশে গমন করেন না, জাহাজারোহণ করিলে তাঁহাদিগের জাতি নাশ হয়, কিন্তু ঘরে বসিয়াই তাঁহারা বিলক্ষণ লভ্য করিতেছেন………

…এখানে আফিম ও লবণ বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাজ-পুরুষেরা বিপুলার্থ রাজকোষে গ্রহণ করিতেছেন, অল্প পরিশ্রমে পাটনা অঞ্চলে আফিমাকর পোস্ত বৃক্ষ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার চাস করিয়া কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা ব্যবহারের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আফিম প্রস্তুত করিলে তাহার রক্ষা থাকেনা, চোর ডাকাইত অপেক্ষাও তাহার গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে, লবণ বাণিজ্যও ঐরূপ বলিতে হইবেক……

বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক ও একচেটিয়া আকর্ষণ ও লবণ বাণিজ্য ব্যতীত ভূমির রাজস্ব, ষ্টাম্পের কর, গুদারার কর, মোকদ্দমায় খরচা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর টাকা আয় হইয়া থাকে ……রাজপুরুষেরা এত টাকা লইয়া কি করেন, কেবল স্বদেশীয় আত্মীয়গণের উদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, অমুক সাহেব অমুক বড় সাহেবের শালা, তিনি প্রতি মাসে যত কর্ম্ম করিতে পারুন বা না পারুন তিনি সহস্র টাকা মাসিক বেতন তেঁহ অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন…”

খবরটি পাঠ করতে করতে যুগ এবং সময়ের জ্ঞান হারিয়ে সাহেবদের গুষ্টির শ্রাদ্ধ করতে করতে অনন্তবিজয় পিপাসার্ত চাতকের মত ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াতেই আকাশবিজয় ঘরে এসে প্রবেশ করে।

একমাত্র পৌত্রটি তার প্রিয় হওয়া সত্বেও ধপ্ করে বাস্তবের মধ্যে ফিরে আসার আঘাত সহ্য করতে না পেরে ধৈর্য হারিয়ে অনন্ত-বিজয় চেঁচিয়ে ওঠে—কি চাই?

পিতামহের রুদ্ররূপ কালেভদ্রে দেখলেও, এ-সময়ে এইধরণের মেজাজ দেখে আকাশ একটু অবাক হয়। তবু জানে, ওইসব আস্ফালনের পেছনে আদৌ কোন হিংস্রতা নেই। একমাত্র সে-ই জানে এই খবরটা। আসলে তার প্রতি অনন্তবিজয়ের যে প্রবল স্নেহ রয়েছে সে'বিষয়ে সে সজ্ঞান।

তাই এগিয়ে এসে বলে,—বড় কাকু বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

অফিসের কথা ভুলে গিয়ে অনন্তবিজয় প্রশ্ন করে,—কি করে বুঝলি?

আকাশবিজয় যতটা সম্ভব কারণগুলো বলল। অনন্তবিজয় বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলল,—এখন কি করা যায়। ও তো কিছুই করত না বলতে গেলে। বৌমার কাছে টাকাপয়সা বিশেষ আছে বলে মনে হয় না।

নেই।

পৃথ্বী সাহায্য করতে পারত। তারও চাকরিটা খোয়া গেল। তবু ডাক্তার দেখানো দরকার। তুই ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারবি?

টাকা?

একবার দুবার দেখানোর টাকা আমিই দেব। প্রশান্ত যদি কিছু দেয়। ওর কাছে যখনি কিছু চাওয়া যায় বলে, কম্পানীর অবস্থা খারাপ! কী যে কম্পানী। যাহোক, এ ডাক্তার কিন্তু অন্য ডাক্তার। জানিস তো?

আকাশ ঘাড় কাত করে বার হয়ে যায়। বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে মরমী তাকে ডাকছিল। ওইখানেই ওদের ঘর। কাছে

গিয়ে দাঁড়াতে সে লক্ষ্য করে মরমী রীতিমত বিচলিত। তার মুখ চোখ লাল, চোখে অশ্রু।

কিরে, কি হয়েছে তোর?

বাবা, পাগল হয়ে যাচ্ছে। কী সব বলছে আপন মনে।

জানি।

মরমী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলে—তুই জানিস?

হুঁ।

আমাকে বলিস নি তো?

বলার সময় পেলাম কোথায়? ডাক্তার ঠিক করতে যাচ্ছি।

পয়সা? আমাদের যে কিছুই নেই।

একটা ব্যবস্থা হয়েছে আপাতত। জানিসই তো, ভেঙে পড়ার আগেও আমরা মুখার্জি পরিবারের একে-ওকে আঁকড়ে ধরে যতক্ষণ পারি দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করি।

মরমী আকাশের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। তারই সমবয়সী আকাশ। দু'জনার মধ্যে বলতে গেলে একটা পাকাপোক্ত বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছে। তবু অনেকসময়ই আকাশকেই তার মনে হয়েছে আনস্মার্ট, আবার কতবার মনে হয়েছে, সে অসাধারণ। ছেলেবেলা থেকে দেখেও একে সে চিনতে পারছে না। শুধু একটি কথা সে মনেপ্রাণে জানে এই পরিবারের সবার প্রতি আকাশের মমতা সম্ভবত সীমাহীন।

দুবারের বেশী ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়নি অমরবিজয়কে। ভিজিট যদিও সংগ্রহ করা যায়, সমানে ওষুধ খাওয়ানো কখনো সম্ভব নয়। প্রতিটি দিন কয়েকবার করে ওষুধ খাওয়াতে হবে। হয়তো সারাজীবন। অসম্ভব। অনন্তবিজয় হতাশ হয়েছিল। প্রশান্ত শাজাহানের ধরণে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল। কিছুটা চেষ্টা করেছিল পৃথ্বীবিজয়। সে চাকরি খোয়া যাবার পরে একেবারে বসে ছিল। সামান্য পুঁজি ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে চলছিল। অমরবিজয়ের চিকিৎসার জন্যে নিজে উদ্যোগী হয়ে একটা সামান্য চাকরী যোগাড় করেছিল

এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু তার পক্ষেও ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌সান মত সব ওষুধের পয়সা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে কিছু কিছু ওষুধের টাকা এখনো যুগিয়ে যাচ্ছে সে। আর কেউ জানুক আর না জানুক আকাশ জানে সেই টাকা ওষুধের বদলে প্রাণীকটির উদরপূর্তিতে ব্যায় হয়ে যাচ্ছে। বলার কিছু নেই। অনেক ভেবে চিন্তেই মরমীদের কিছু বলতে পারেনি আকাশ। এ-বাড়িতে ওদের ঘরের মত দুর্ভিক্ষ আর কোন ঘরে নেই। অমরবিজয় তেমন ভাবে সুস্থ হয়ে কখনো কোন কাজ করে পয়সা রোজগার করবে বলে বিশ্বাস হয় না আকাশের। তার চেয়ে বড় কাকী আর মরমী খেয়ে বাঁচুক। বড় কাকী মাঝে মাঝে মরমীর বিয়ের কথা বলে। দুশ্চিন্তা তার খুব। যদি দারিদ্র মরমীর রূপ কেড়ে নেয়? ভাবনাটা আকাশের মস্তিষ্কেও ক্রিয়া করতে সুরু করে। সে ভাবে এমন রূপবতী মরমীর রূপ চলে যাবে? বিশ্বাস হয় না। স্বপ্নেও বিশ্বাস করবে না সে। মরমী যেন মোমের পুতুল। কিন্তু গড়নটা পুতুলের মত নয় কখনই। পুতুলের মত গড়নকে আর যে-ই সুন্দরী বলুক সে বলবে না। এ-বাড়ির ছেলে বলেই রূপ সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারনা আছে। সে ভালভাবে জানে, শুধু রঙের জন্যই নয়, ফিগার এবং মুখশ্রীর জন্যেও মরমীকে যদি মিস্‌ ইউসিভার্স কম্পিটিশানে পাঠানো যায় তাহলে সে মাথায় রানীর মুকুট পরে ফিরে আসবে। তবে তার আগে দীর্ঘদিন তাকে পরিপূর্ণ খাদ্য দিতে হবে, বিশ্রাম দিতে হবে। নিদ্রার মধ্যে তাকে সুখস্বপ্নও দেখাতে হবে—যেমন দেখে ওই সব উঁচুতলার বাড়ির মেয়েরা।

কিছু কিছু ওষুধ খাওয়ার ফলে অমরবিজয় পুরোপুরি সুস্থ না হয়ে আধপাগলা হয়ে থাকে। কখনো কখনো একটু বাড়াবাড়ি হয়, কখনো মনে হয় প্রায় স্বাভাবিক। অনন্তবিজয়ের মত অমরবিজয়ের সেকেলে পত্র-পত্রিকা টেনে নিয়ে পড়ার নেশা ছিল। নিজেকে সেই যুগের একজন ভেবে সুস্থ অবস্থাতেও সে আনন্দ পেত। অথচ দিগ্বিজয়কে সব সময় বলত পেছনে তাকাবি না এগিয়ে যাবি শুধু। পেছনে

কিছু নেই। আছে মন-ভোলানো ফাঁদ। শেষ হয়ে যাবি।

নিজে কিন্তু অমরবিজয় সেই ফাঁদের মধ্যে আঁটকে গিয়ে নিশ্চিন্তে ছিল। ভাল লাগত। কতসময় সে কল্পনা করেছে বেলগাছিয়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের উদ্যানে মাইকেল মধুসূদনের 'রত্নাবলী' নাটক দেখতে গিয়েছে। অনেকের মত সে-ও মুখোপাধ্যায় বংশের এক বিশিষ্ট অতিথি। সেখানে ছোটলাট হেলিডে সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে অতিথিদের আসনে বসতে গিয়ে পর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা ইশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত রামনারায়ন তর্করত্নের সঙ্গে নমস্কার প্রতি-নমস্কারের পালা শেষ করে আসন গ্রহণ করে রাত্রি দুই প্রহর অবধি নাটক দেখে অশ্বশকটে চেপে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে। অনন্তবিজয়ের মত তার কাছেও বর্তমান অতীত সব একাকার হয়ে যেত। ওটাই হয়ত পাগলামীর প্রাথমিক একটা লক্ষণ। তবে তখন মনের সেই অবস্থার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এখন মাঝে মাঝে সেটিও দেখা যায়। এখন কখনো দেখা যায় সে নিজেকে বিদ্যাসাগর হিসাবে কল্পনা করে হিন্দু ধর্মানুযায়ী 'বিধবা বিবাহ' যে অধর্মের কিছু নয়, তারই পক্ষে যুক্তি রাখছে। আর আশ্চর্য, মাঝে মাঝে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ধৃতি দেয়। কখনো হিন্দুমেলায় ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে জানাভ বক্তৃতা দিতেও শোনা যায় তাকে।

আকাশ অনন্তবিজয়কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছে, ছাত্রাবস্থায় অমরবিজয় অত্যন্ত মেধাবী ছিল। ইস্কুলে বরাবর প্রথম হতো। তারপর একটু উঁচু ক্লাসে উঠে সে হঠাৎ বাধা ধরা পঠন পাঠনের প্রতি তার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। সে ঘুরে ফিরে পুরোনো কলকাতার ইতিহাস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার বাবা তখন মারা গিয়েছেন। অনন্তবিজয় অনেক চেষ্টা করেছিল তার মতি ফেরাতে। পারেনি। নইলে, সে যদি পড়াশোনা চালিয়ে যেত তাহলে সত্যবিজয়ের মত চামড়ার ব্যবসা না করেও জজ ব্যারিস্টার হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারত। তাহলে মরমী মহানগরীর

সেরা সুন্দরী হতে পারত। আর তার পানি প্রার্থী হবার জন্য সু-প্রতিষ্ঠিত পাত্রদের ভীড় লেগে থাকত।

কিন্তু কল্পনা তো সত্যি নয়। লটারীর টিকিটে ফার্স্ট' প্রাইজ পাওয়ার মত অলীক চিন্তা মাথায় এনে কোন লাভ নেই। নির্মম সত্যটা সামনে রেখে চলাই ভাল। নির্মম সত্য হলো মরমীরা পেট ভরে খেতে পায় না।

চাঁপা গাছে ফুল ফুটেছিল। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে আকাশ কিছু ফুল নিয়ে আসতে গেল। চাঁপার সময় চাঁপা, শিউলীর সময় শিউলি আর শীত কালে গাঁদা ফুল নিয়ে এসে দিগ্বিজয়ের ফটোর নীচে এনে রাখে আকাশ। চোখের জল সে বিশেষ ফেলেনি! কিন্তু দিগ্বিজয়ের সামনে ফুল রেখে ফটোর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অভিমানে তার মন কতসময় ভরে উঠেছে। কত সময় তার চোখ সজল হয়ে উঠেছে। মনে মনে বলেছে, তুমি বেঁচে থাকলে এই বাড়ির বিরাট বোঝা বয়ে চলতে হতো না। আর চললেও, তোমার অনুপ্রেরনায় বোঝাকে বোঝা বলে মনে হতো না। কখনো বলেছে, তুমি আমাকে ভালবাসতে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলে না। পারলে, তোমার পথ বেছে নিতে পারতাম। অমন সুন্দর ভাবে মৃত্যুকে বরন করে নিতে পারতাম। সেদিন তোমার দেহ যখন তুলে আনলো ওরা, মনে হয়ে ছিল তুমি বুঝি বাঘা যতীন। আবার জন্মগ্রহণ করেছিলে আর এক মুখোপাধ্যায় বংশে। আমিও অমন হতে পারতাম। আমাকে ভীরু' ভেবেছিলে, না ছেলেমানুষ?

ফুল তুলতে তুলতে নানান্ চিন্তায় আকাশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

কিরে আকাশ —

পেছন ফিরে দেখে মরমী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে আকাশ একটু হাসে।

ছেলেদের অত ফুল তুলতে নেই। ওটা মেয়েদের কাজ।

নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিস দেখছি।

আবিস্কার হবে কেন? চিরকাল তাই হয়ে আসছে। একদিন দেখব হয়ত মালা গাঁথতে বসে গিয়েছিস। এসব করলে মন নরম হয়ে যাবে।

চুপ্ কর তো সকালে উঠেই আরম্ভ করেছিস।

মরমী হেসে ফেলে। তার হাসি খুব সুন্দর। আকাশ ভাবে. যার সবটুকুই এত সুন্দর, তার কপালটা অত সুন্দর কেন হলো না।

মরমী বলে,—আর তুলিস না. আমাদের জন্যে কিছু রাখ।

কিছু আনিস নি তো।

পরে আনব।

এখন এলি কেন?

মরমী একটু গম্ভীর হয়। একগাদা গোবর দেখিয়ে বলে,—ঘুঁটে দেব।

আকাশের বুকের ভেতরে টন্ টন্ করে ওঠে। মরমী তার মুখে কী লক্ষ্য করল কে জানে। শুক্‌নো হেসে বলে,—তুই মেয়ে হলে ভাল হতো।

কেন! একথা বললি কেন?

জানিনা। আর কল্যানী যদি ছেলে হতো—

তুই আমাকে অপমান করছিস।

মরমী হেসে উঠে বলে—বারে, মেয়েরা বুঝি নিকৃষ্ট জীব? এতে অপমানের কি হলো?

অপমান এই জন্যে যে তুই বলতে চাস আমার স্বভাব মেয়েলী।

মরমী এবারে খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর এগিয়ে এসে আকাশের একটা হাত ধরে বলে—নারে, আমি সেজন্যে বলিনি। তোর মন এত নরম। আমার ভয় হয়, তুই কখনো আঘাত পেলে সামলাতে পারবি তো?

আকাশ মরমীর চোখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে—আমার

জন্যে তোকে ভাবতে হবেনা। নিজের কথা ভাব। তুই আঘাত সইতে পারবি তো?

মেয়েরা সব পারে।

চপলাসুন্দরীর দিন চলে গিয়েছে মরমী। মেয়েরা সব পারে, এতবড় সার্টিফিকেট অতি বড় মুর্খও এযুগে দেবেনা। আমি তোর জন্যে একটু আধটু ভাবি।

মরমীর চোখে কৌতুহল উকি দেয়। সে রসিকতা করে বলে,—সত্যি নাকি? কী ভাবিস!

তুই মনে করছিস, আমি বুঝি ঠাট্টা করছি। তোর বিয়ের কথা কাকীমা আমাকে কয়েকবার শুনিয়েছেন।

জানি। তুই পাত্র দেখবি নাকি?

মরমীকে মাঝে মাঝে আকাশ ছোট-চপলা বলে ক্ষেপাতো। সে বলে, আমি পাত্র দেখলে ছোট-চপলার পছন্দ হবে না।

কেন?

সবার দেখা কি একরকম হয়। তুই যে চপলাসুন্দরীর চোখে পৃথিবীটাকে দেখিস!

মরমী বিমর্ষ হেসে বলে,—আমার কোন চোখই নেই। আমি অন্ধ। কারণ, আমার বাবার কোন ক্ষমতা নেই মেয়ের বিয়ে দেবার। অন্ধ না হয়ে উপায় আছে? হাত ধরে যার কাছে সমর্পন করা হবে সেইখানেই যাব।

আকাশ একেবারে চুপ হয়ে যায়।

মরমী হাতে একতাল গোবর নিয়ে হেসে বলে,—ঘুঁটে কুড়নীর আবার স্বয়ম্বর।

চাঁপা ফুল তুলতে তুলতে আকাশ ভাবে, মরমীর ওই গোবর মাখা হাতের আঙুলগুলোও এই চাঁপা কলির মতই। বরং তার চেয়েও সুন্দর। তবু তার পাত্র জোটানো মুশকিল। চপলাসুন্দরী বলত, অতি বড় রূপসী না পায় বর অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর। কথাটার মধ্যে একটু আধটু সত্যি থাকতেও পারে।

মরমী দেওয়ালের গায়ে ঘুঁটে দিতে আরম্ভ করে। এই মরমীই কয়েক বছর আগেও ফ্রক পরে তারই সঙ্গে চাঁপা গাছের ডালে উঠে ফুল তুলতো। সংসারের উত্তাপ কাকে বলে সে জানত না। ছোট -চপলা হয়ে মাঝে মাঝে জ্ঞানের কথা শোনাতো।

আকাশ একটু ইতস্তত করে ডাকে—মরমী।

তার ডাকের মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল, তার জন্যে মরমী থেমে যায়। আকাশের দিকে চেয়ে বলে,—কিছু বলবি!

আকাশ তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে,—একটা কথা বলব?

বল্।

তোর রূপ আছে, নিশ্চয় তুই জানিস। আয়নায় নিজের মুখ কে না দেখে?

কি বলতে চাইছিস।

লোকে যতই বলুক, মানুষের স্বভাবই সব চাইতে বড়, মেয়েদের বেলায় কিন্তু তার রূপই প্রধান। কত বড় বড় মহাকাব্য আর কাব্য লেখা হয়েছে মেয়েদের রূপ নিয়ে। রূপসী নারী ইতিহাসের গতি -প্রকৃতি বহুবার পালটে দিয়েছে।

তুই লেকচার স্নুরু করলি দেখছি।

না, আমার বলতে ভরসা হয় না। চপলাসুন্দরীর একনিষ্ঠ শিষ্যা তুই কিনা। তাই সোজাসুজি বলতে পারছি না।

মরমী চোখের মধ্যে কাঠিন্য এনে বলে,—আকাশ তোর কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেল। অনেক ঘুঁটে দিতে হবে। যদি বলতে না পারিস না বলাই ভাল।

বলছিলাম কি। তোর বর তুই নিজে নির্বাচন করে নে বরং।

আকাশ!

অমন আড়ষ্ট হয়ে যাস নে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে। তুই একবার শুধু ভুলে যা, ইন্দ্রবিজয়ের যুগে বাস করছিস। এ-যুগটা অনেক এগিয়ে গিয়েছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু এই বাড়িটা।

আকাশ। তুই একথা বলবি আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

স্বপ্নে তোকে ভাবতে বলিনি, বাস্তবে ভাবার চেষ্টা কর।

তোকে আর আমার হিতৈষী হতে হবেনা। সব বুঝেছি।

শোন মরমী, আমি আর অচ্যুৎ মিলে ছেলের খোঁজ নিতে পারি। পছন্দ হলে তেমন ছেলের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিতে পারি। স্বজাতিই দেখব আপত্তি হবে না কারও। শুধু তোকে একটু সক্রিয় হতে হবে। মেয়েদের সজীব পোঁটলা হয়ে থাকার দিন অনেক আগে বিদায় নিয়েছে। তুই একটু বুঝতে চেষ্টা কর। নিজের বর নিজে নির্বাচন করতে অন্যান্য মেয়েদের যত অভিনয় করতে হয়, যতদিন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়, তোর বেলায় তার কিছুই দরকার হবে না। তুই আমার বোন হলেও একথা বলছি। দুদিন একটু হেসে কথা বললেই হবে।

আর শুনতে চাইনা আকাশ। তুই বরং ঘরে যা—

ঠিক আছে। একটা কথা বলি তবে। মুখোপাধ্যায় বংশের ওপর এতই যখন তোর দরদ, এই সাত সকালে ঘুঁটে দিয়ে ধরা না পড়ে, দুপুরে সবাই যখন বিশ্রাম করবে সেই সময় ঘুঁটে দিস্। বংশের সম্মানও থাকবে, তোদের কিছু সুরাহাও হবে।

আশ্চর্য হয়ে আকাশ দেখল মরমী বাধ্য মেয়ের মত তার কথা শুনে, পেছনের দেওয়ালে লাগানো জলের কলে হাত ধুয়ে ফিরে গেল।

২

মরমীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। আধ-পাগলা অমরবিজয়ের মেয়ে মরমী। আকাশবিজয়ের মন একটু বিমর্ষ হলো। কারণ মরমী তার সমবয়সী, উনিশ থেকে একুশের মধ্যে। আকাশবিজয়ের ছেলেবেলার খেলার সাথী। খেলার সাথী থাকতে থাকতেই হঠাৎ একসময় তাদের আগাছায় পরিপূর্ণ বাগানের মানকচু গাছের মতো ধাঁ ধাঁ করে বেড়ে উঠল মরমী। তার মনটাও কেমন যেন বাল্য আর কৈশোরের সীমানা ছাড়িয়ে শোভনা পিসির ছেলে ঘোটনের পেট-কাটিয়া ঘুড়ির মতো সোঁ সোঁ করে বেড়ে গেল। আকাশবিজয়

কিছুতেই তার আর নাগাল পেল না। সে লক্ষ্য করল, রোগা ফর্সা মরমী কেমন যেন শাঁখের মতো চকচকে হয়ে উঠল। তার গাল টুক্‌টুক্‌ করতে থাকে। তার ছিপছিপে শরীরে নানান উত্থানপতন দেখা গেল। আর সে? যেমন ঝিট্‌কে ধরা ছিল তেমনই রয়ে গেল। মনও তার ইলেকট্রিক তারে আটকে যাওয়া ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ির মতো ছোট্ট সুতো নিয়ে একই জায়গায় পত্‌পত্‌ করতে লাগল।

তবু মরমীর বিয়ে ঠিক হওয়ায় মনে দোলা লাগল আকাশের। অথচ তার বিয়ে হোক এটা আকাশ চাইত। তার বিয়ে হলে বড় কাকী কিছুটা নিশ্চিন্ত হবে। কিছুকাল থেকে মরমী যেন অনেক উঁচু থেকে তার দিকে দু'একটা কথা ছুঁড়ে দিত মাঝে মধ্যে। তবু সে মরমীকে চিনতে। মরমীও চিনত তাকে। তাই এক একসময় দুজন মিলেমিশে কেমন একাকার হয়ে যেত। তখন মরমীর সেই উঁচু উঁচু ভাবটার কথা মনে থাকত না। সম্পর্কে বোন হলেও তাদের মধ্যে নিবিড় সখ্যতা ছিল।

আকাশবিজয় অনুভব করে মরমীও হলো এই বংশের শেষ অনুগতা কন্যাসন্তান। অকালে পরিপক্ক হয়ে উঠলেও, বিদ্রোহ করার মতো মানসিক কাঠামো তার ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই তার কথাবার্তায় চপলাসুন্দরীর সুর বেজে উঠত। তাই তাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে 'ছোট-চপলা' বলে ডাকলে খুশিই হতো মরমী।

যাক্‌, বিয়ে ঠিক হয়ে বেঁচে গেল বেচারা। সবই তো জানে আকাশ। দুপুরে যখন সবাই ঘুমোতো, তখন মরমী লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির পেছন দিকটায় ঘুঁটে দিত। কী করবে? বাবা তার অসুস্থ মস্তিষ্কের, মা বুদ্ধিমতী হলেও শারীরিক দিক দিয়ে অশক্ত। অথচ মেয়ের বয়স থেমে থাকে না। শেষে চন্দননগরের ভাই-এর কাছে তার মা চিঠি লেখায় কাজ হলো। ভাই সম্বন্ধ ঠিক করে দিল।

এ-বাড়ির মেয়েদের একটু মেজে-ঘষে কনে দেখায় বসিয়ে দিলে কখনো অপছন্দ হয় না। দেনা-পাওনার কথাও মনে থাকে না অনেক বরকর্তার। মরমীকে দেখতে এসেছিল তার ননদ আর দূর সম্পর্কের

খুড়শ্বশুর। বরপক্ষকে দেখে অনেকের মনে 'কিন্তু কিন্তু' ভাব এলেও, ওরা পছন্দ করে ফেলায় আর আপত্তি ওঠেনি। কিছু খরচা হবে অবশ্য। আকাশ লক্ষ্য করে, যে-মামাকে আগে বড় একটা দেখা যায়নি এ-বাড়িতে সেই মামাই উদ্যোগী হয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলছে। বোন আর ভগ্নিপতির দশা দেখে অনুকম্পার উদ্রেক হয়েছে হয়ত। তবে মরমীর মুখখানার দিকে চেয়েই হয়ত মামা আর বসে থাকতে পারেনি। ছেলেবেলায় আকাশ মরমীর কাছে এই মামার অনেক গল্প শুনেছে। মামার মতো মানুষই হয় না। পৃথিবীতে তাকেই নাকি সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। এখন দেখে মনে হচ্ছে, মরমীর বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল। আসা-যাওয়া আগের মতো না থাকলেও মামার ভালবাসা ছাই চাপা ছিল। উস্কে দেওয়ায় জেগে উঠেছে।

পাত্রটির বংশ ভাল। লিলুয়ার গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার। পড়তি বনেদী। নাম-ডাক ছিল এককালে। পূর্বপুরুষের একজনের নামে গঙ্গার এক ঘাট আছে। তাছাড়া এই পরিবারেরই কোনো এক সতীর সহমরণে যাবার প্রমাণ হিসাবে ইষ্টক-ফলক রয়েছে। এ সব কথা শুনে মরমীর গায়ে নাকি শিহরন জাগছে বারে বারে। অনেকদিন পরে মরমী যেন আবার ছেলেবেলার মরমী হয়ে উঠেছে। এক একবার আকাশবিজয়কে এক এক কথা বলে যাচ্ছে।

ভাবতে পারিস আকাশ? সহমরণ! উঃ—

কেন? খুব ভাল নাকি জিনিসটা? তেঁতুলের আচারের মতো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে মরমী বলে ওঠে—ভাল না? বলিস কিরে? সতীসাধ্বী স্ত্রী—

আকাশবিজয় হাঁ করে আধুনিক যুগের চপলাসুন্দরীর দিকে চেয়ে থাকে। সে জানে, আসল চপলাসুন্দরী অনেক ক্ষেত্রে আবার অদ্ভুত রকমের উদার ছিল। কিন্তু মরমী শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়াবে কে জানে।

সতীসাধ্বী? সে তো সেই কবেকার এক বউ। এবারে বল

তো শুনি পাত্রটি কেমন ?

সে কথা আমি কেমন করে জানব ?

শুনিসনি মামার কাছে ? আসলটাই শুনিস নি ?

জুটমিলে কাজ করে। অবিবাহিতা বোন আছে।

চেহারা ?

ছেলেদের আবার চেহারা।

মরমী তার কিছু না বলেই ছুটে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। দিগ্বিজয়ের সংস্পর্শে এসে আকাশবিজয় ভগবানের নামে শপথ করা বা হা-হুতাশ করা অনেকদিন ভুলে গিয়েছিল। তাই ভগবানকে না ডেকেও মনে মনে মরমীর মঙ্গল কামনা করে ভাবে, শ্বশুরবাড়িতে তাকে যেন অন্তত ঘুঁটে দিতে না হয়।

বিয়ের দিন বরযাত্রীদের দেখে বাড়ির সবাই চোট খায়। এসেই দল বেঁধে উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করে। এই সেকেলে বাড়ি দেখে এমন সব মন্তব্য করতে থাকে যা শুনে মরমীর মামা অবধি স্তম্ভিত হয়ে যায়। বারবার তাদের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে। তবু সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে।

আকাশবিজয় মামাকে একান্তে ডেকে বলে,—মরমী বলত, পৃথিবীতে নাকি আপনি ওকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। বেশ তো ছিল। এই সর্বনাশ কেন করতে গেলেন ?

মামা প্রায় কেঁদে ফেলে বলে—ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি ওর মঙ্গলই আমি চাই। কিন্তু আমি বড়লোক নই। বেশি পণ দিয়ে বিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। অল্প খরচে, অনেক খোঁজখবর নিয়ে এই পাত্র যোগাড় করেছি। সবাই বলেছে, পাত্র মোটামুটি ভাল। তাছাড়া বংশটা নিঃসন্দেহে ভাল। বরযাত্রী যদি অসভ্য হয় কি করতে পারি। এখন প্রার্থনা পাত্রটি যেন ভাল হয়।

অনন্তবিজয় বাড়ির সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আশীর্বাদ করার জন্য তাকে বলে রাখা হয়েছে। সে-ও বিকেল থেকে গিলে করা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। বহুদিন পরে

এই পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ এসেছে তার। অথচ কেউ ডাকছে না। না ডাকলে নিজে থেকে যায় কি করে। তাছাড়া নিচে যেন তাণ্ডব চলছে। মরমীর মা তার লুকিয়ে রাখা দুটো কানপাশা ভেঙে বরের আশীর্বাদের আংটি তৈরি করেছে। সে যখন শতচ্ছিন্ন কাপড় বোঝাই একটা মস্ত তোরঙ্গ খুলে বহুদিনের হাজারটা পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে খুলে চকচকে দুটো কানপাশা ভাই-এর হাতে তুলে দিয়েছিল বরের আংটি তৈরির জন্য, তখন তার আধ পাগলা স্বামীর চোখ দুটোও বিস্ময়ে চকচক করে উঠেছিল। কারণ কদিন আগেই এমনিভাবে দেয়াল আলমারির ভেতরে একটা পুরোনো শ্বেতপাথরের ভাঙা গেলাসের ভেতর থেকে একটা সাতনরী হার বের হয়েছিল। তাই দিয়ে মরমীর জন্য চারাগাছা চুড়ি, একটা হার আর একজোড়া দুল তৈরি করতে দিয়েছিল। ফলে মরমীর মামা নিজের টাকায় ভালমন্দ খাওয়া দাওয়ার একটু ব্যবস্থা করতে পেরেছে। পৃথ্বীবিজয়ও কিছু দিয়েছে।

অনন্তবিজয় তার দোতলার ঘর থেকে একবার হুংকার দিয়ে ওঠে। আকাশবিজয় মুচকি হাসে। এ-হুংকার যুগপৎ বহুক্ষণ উত্তেজিত অবস্থায় বসে থাকা এবং আফিম সেবনের সময় অতিক্রান্ত হবার অভিব্যক্তি। তবু অনন্তবিজয় এর পরে একটা কিছু করে ফেলতে পারে ভেবে, বিয়ে বাড়ির সবচেয়ে করিৎকর্মা মহিলা ঘোটনের মাকে কাছে ডাকে আকাশবিজয়।

পিসি, আশীর্বাদের ব্যবস্থা করে ফেল তাড়াতাড়ি।

একদল বাঁদর এসেছে—আমি কি করব ?

দাদু যে ক্ষেপে যাবে।

সে তো বুঝতে পারছি। বিয়ের আগে মেয়ের ঘরে হামলা করতে কখনো দেখেছিস বরযাত্রীদের ? মরমীর কপালে কি আছে কে জানে।

ওসব নিয়ে অত ভেবো না। বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে যেতে দাও।

পিসিকে বিশেষ নিশ্চিন্ত বলে মনে হলো না। তাই সে নিজেই গেল মরমীদের ঘরের দিকে।

বাড়িতে তোশাখানার অস্তিত্ব এখনো রয়েছে। আগেকার দিনে বাড়ির সামনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া সরু একটা দোতলা ঘর ছিল। তাতেই থাকত পুরোনো আমলের আসবাব থেকে শুরু করে নকশা-কাটা চাঁদোয়া, ভেলভেটের ভারী পর্দা ইত্যাদি বহু জিনিস। সেই তোশাখানার অস্তিত্ব অনেকদিন ধুয়ে মুছে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট কিছু পোকায় কাটা পর্দা, বাহারি বালিশ, ফুলদানী ইত্যাদি চিলেকোঠায় বন্ধ করে রাখা হয়। উৎসবে পার্বণে বাড়ির যে কেউ ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পারে।

বরের ঘরের মতো মরমীর ঘরের সামনেও পর্দা টাঙানো হয়েছিল। একটা ঝাড়বাতি ঝুলিয়ে দিয়েছিল প্রশান্তবিজয় নিজে উদ্যোগী হয়ে। যাত্রায় অভিনয় করলেও মরমী তাকে শ্রদ্ধা করে একটু সে জানে। আকাশবিজয় পোঁছে দেখে বরযাত্রীর দল ইতিমধ্যেই মরমীকে দেখে নানা রকম অশ্লীলতা-ঘেঁষা প্রশংসা করছে। তারা হৈ চৈ করে পর্দাগুলো টেনে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। আকাশ ক্রোধ দমন করে ওদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছে বরকর্তা কোথায় জানতে চায়?

সঙ্গে সঙ্গে কলরব ওঠে—তাই তো বরকর্তা কোথায়? কোথায় লুকিয়েছে সেই শালা? চল নরেনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আসল সময় ঘাপটি মেরে বসে আছে।

বরের নাম নরেন, আকাশবিজয় সেকথা জানে। সে নিজেই তাড়াতাড়ি বরের কাছে যায় এবং আশীর্বাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বরের রূপ আগেই দেখেছিল। মরমীর জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই তাই বলে। মরমীর কথাই বোধহয় ঠিক। পুরুষের চেহারার আর কি দরকার? মেয়েরাই যদি তা দরকার বলে মনে না করে?

আকাশের প্রশ্নে নরেন বলে—তাই তো। মেয়েকে আশীর্বাদ করার চল আছে বটে। কিন্তু সে তো গয়না-টয়না দিতে হয়। তাই

না ?

বোধহয়।

আমার সঙ্গে কিন্তু ভাই এসব নেই।

অন্তত ধান-দুব্বো দিয়ে—

গুরুজনও কেউ নেই। সেই ব্যাটা খুড়ো। কনে দেখতে এসেছিল সে কিছুতেই আসতে চাইল না। ও হ্যাঁ আছে। ভোম্বল আছে।

ভোম্বল ?

হ্যাঁ। আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হবে—সাক্ষাৎ কাকা আমার। আমার ঠাকুর্দার ছোটভাই—এর ছেলে। ও নিশ্চিন্তে আমার সাথে বিড়ি ফোঁকে। এক পুরুষের এদিক-ওদিক তো।

ইতিমধ্যে 'বরকর্তা' 'বরকর্তা' বলে সবার সামনে যে চ্যাংড়া ছেলেটি এগিয়ে আসছিল তাকেই নরেন ধমকে ওঠে—এ্যাই ব্যাটা, চুপ কর। তুই তো বরকর্তা।

এ্যাঁ ? আমি—যাঃ।

তুই আমার কাকা নয় ?

হ্যাঁ। একশোবার। কোন শালা অস্বীকার করে ?

আশীর্বাদ করতে হবে তোকে।

আমি ? যাঃ।

আকাশবিজয় তাড়াতাড়ি বলে—এক কাজ করুন। আপনাদের পুরোহিত মশায় বৃদ্ধ ব্যক্তি। উনি আশীর্বাদ করুন।

সবাই বলে ওঠে—বাঃ বেড়ে বলেছেন। বুদ্ধি আছে তো। আপনি কি তাঁর—

ভাই।

বাঃ বাঃ। হয়ে যাক্ তবে। আশীর্বাদ হয়ে যাক্।

এরপর সবই হলো। শুধু অনন্তবিজয় আশীর্বাদ করতে এসে বরের মুখের দিকে এক পলক চেয়েই আচমকা পেছন ফিরে চলে আসতে চেয়েছিল। আকাশবিজয় শক্ত করে দাদুর হাত চেপে ধরে

শরীরটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কোনোরকমে মন্ত্র পড়ে অনন্তবিজয় বরের হাতে আংটি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে বাঁচে। একটা দৃশ্যের অবতরণা হতে যাচ্ছিল।

পেছনে পেছনে দাদুর ঘরে ঢুকতেই অনন্তবিজয় চেঁচিয়ে ওঠে—খুব তালেবর হয়েছিস, তাই না ?

কেন দাদু ?

চেপে ধরলি কেন ? ওকে বাশীর্বাদ করতে হয় ?

মরমীর কথা ভাববে না। লগ্ন চলে গেলে ওর বিয়ে হতো না আর।

জন্মে জন্মে না হোক। মরমীর পাশে ওই গোরিলা ? অসুরের পায়ে শিউলি ফুলের অঞ্জলি ?

দাদু।

না। আমি কারও দাদু নই। তোরা বংশের মর্যাদা রাখতে শিখলি না।

বংশের কথা যদি বল, তাহলে ওদের বংশেও ফেলনা নয়।

ঢের হয়েছে। অন্য রক্ত মিশেছে, বুঝলি ? অন্য রক্ত মিশেছে। হয় বাপের বংশে, নইলে মায়ের বংশে। চেহারাখানা দেখেছিস ? ঠিক যেন সেই আগের কালের জাহাজের সাহেব-খালাসী। নাকের ডগা মোটা হয়ে উঁচুর দিকে। চোখগুলো গোল্লা—অথচ কুতকুতে। সাহেব হলে নীল নীল দেখাতো। ছোট্ট ভ্রূ। চোখের পাতায় চুল নেই। একেবারে জাহাজী সাহেবের বাঙলা সংস্করণ। ছ্যা-ছ্যা, এ হবে মরমীর স্বামী ? আর আমি করলাম আশীর্বাদ ?

ওর কাকা, ভোম্বলটা দেখতে ভাল কিন্তু।

ভোম্বল ?

হ্যাঁ। বোঝা যায়, তোমার মতো প্রাচীন বংশের ছেলে।

আমার মতো মানে ? ঠাট্টা হচ্ছে ? তুই তবে কোন বংশের ছেলে ?

আমি ওসব বুঝি না দাদু।

দাছুর হাতে আফিমের কৌটো তুলে দিয়ে আকাশবিজয় তাড়াতাড়ি বার হয়ে আসে।

লগ্ন ছিল প্রায় প্রথম রাতেই। তাই খেয়ে দেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বরষাত্রীর দল বিদায় নিল এক সময়ে। বাড়ি শান্ত হলো, কিন্তু বাসরঘরে জেগে বসে থাকার মতো কাউকে পাওয়া যায় না। কল্যাণী আর শকুন্তলার প্রথমে খুব উৎসাহ ছিল। কেন যেন হঠাৎ ওরা বেঁকে বসল। বরের সঙ্গে কথা বলল না একটাও। অথচ বর খারাপ ব্যবহার করেনি। ওদের দেখে হেসেছে, কাছে ডেকেছে। ওরা কিন্তু এড়িয়ে গেল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল নিজের ঘরে আকাশ। অনেক রাতে, বোধহয় শেষ রাতের কিছু আগে কে যেন তার গায়ে হাত রাখে। তারপর একটু একটু করে ঠেলতে থাকে। আকাশ প্রথমটা চমকে উঠেছিল।

হয়তো চাঁদের আলো ছিল। কিংবা অন্য কোনো বাড়ির বিজলী আলো ঘরে ঢুকেছিল। মোট কথা, বুঝতে অসুবিধা হলো না মরমী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসে আকাশ বলে,—কিরে মরমী? তুই?

ভয় করছে।

কেন, কেন? নরেনবাবু নেই?

আছে। সবাই চলে গেলে স্যুটকেস থেকে একটা চ্যাপ্টা মতন বোতল বার করে মদ খাচ্ছে।

এঁ্যা? তা, আমাদের মতো বনেদী বংশে এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার নয় রে মরমী। যা, চুপচাপ শুয়ে পড়গে।

বনেদী বলে বাসরঘরে খায় ওসব?

তুই তো জানিস ওঁদের বংশ ভাল। হয়ত বিপথে গিয়েছেন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। বন্ধুভাগ্য ওঁর বড্ড খারাপ। তুই যা বাসরঘরে। চলে আসতে নেই নাকি।

শুধু কি মদ? তাহলে আসতাম না।

তবে?

মরমী চুপ করে থাকে। এতদিন মরমীকে কেমন বড় বড় মনে হতো তার চেযে। এখন কেমন অসহায়। আকাশের কাছে ছোট্ট খুকি বলে মনে হলো।

ওদিকে বোধহয় নরেনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ভ্যাড়ভেড়ে গলায় চেঁচাতে চেষ্টা করে—এ্যাই, কোথায় গেলে? চালাকি পেয়েছে?

আকাশের মাথা গরম হয়ে যায়। সে লাফিয়ে ওঠে। মরমী তার হাত চেপে ধরে।

ছেড়ে দে। আমি মানুষ মারতে পারি না, তুই তো জানিস। দিগ্বিজয়দা থাকলে ভাল হতো। তবে সে-ও বোধহয় ছেড়ে দিত, নইলে তুই যে বিয়ের দিনেই বিধবা হবি। আকাশ বাসর ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নরেন তাকে দেখে মদের ঝোঁকে চেঁচিয়ে ওঠে—তুই কি করতে এসেছিস? সে কোথা গেল?

নরেন বাবু, চেঁচাবেন না।

চেঁচাবোনা মানে? আলবৎ চেচাবো। সেই মালটি কোথায় গেল, যাকে বিয়ে করলাম।

আকাশ জানে দরজার আড়লে মরমী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবু সে কেমন উন্মাদের মত হয়ে গেল। ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে একটা বড় লোহার রেলিং-ভাঙা রড নিয়ে আবার ভেতরে ঢুকতে গেলে মরমী চেপে ধরে তাকে।

ছেড়ে দে। ওকে মেরে ফেলে ফাঁসি যাব। তবু বুঝব, তুই নিস্কৃতি পেয়েছিস।

না, না—

তাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে, নরেনের দিকে ছুটে যায় আকাশ। জীবনে এমন উন্মাদ সে কখনো হয় নি। পেছনে মরমী কাঁদতে কাঁদতে বলে,—আকাশ, তুই যে বলেছিলি আমাকে বিধবা হতে দিবি না।

নরেন সমস্ত ব্যাপার দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বলে,—আমার বহুৎ ভুল হয়ে গেছে। আরে বাবা এ-বাড়িতে খুনী আছে জানতাম না। কিছু মনে করবেন না। একটু বেশী খেয়ে ফেলেছি।

মরমীকে দেখিয়ে আকাশ বলে—এর গায়ে হাত দেবেন না আজ রাতে। তাহলে ছাড়তে পারি।

কিন্তু বিয়ে করলাম যে—

সম্বিত ফিরে পেয়ে এতক্ষণে আকাশ সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কী করতে গিয়েছিল সে একটু আগে। শরীরের সমস্ত রক্তটুকুই বোধহয় মাথায় উঠেছিল। এখন ঝপ করে নেবে গিয়েছে।

শক্ত স্বরে বলে—দেখুন নরেন বাবু, আজকের রাতে মদ খাবেন না আর।

ঠিক আছে।

আর আমার বোনের গায়ে আজ হাত দেবেন না, আর একবার বলেদিলাম।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফুলশয্যার দিনে দেব। তাই তো? আমি জানি। আমারও বোন আছে। সে-ও একথা বলেছিল। কিন্তু ওই হতভাগা বিরিঞ্চি ব্যাটা শিশিটা স্যুটকেসের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। ও জিনিস সঙ্গে থাকলে না খেয়ে থাকা যায়? আপনিই বলুন।

বাসর ঘরে, আজ বরং আপনিই থাকুন একা। রাত শেষ হয়ে এলো মরমী ওর মায়ের কাছে গিয়ে শোবে।

কেন কেন, তা হবে কেন?

বাসর ঘরে, বর কনেকে একা থাকতে নেই। আরও অনেকে থেকে বাসর জাগে। চল্, মরমী—

আকাশ মরমীকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

মরমী তার হাত চেপে ধরে বলে—আকাশ।

বড় কাকীর ঘরে যা মরমী।

মরমীর বিয়ের পর বছর খানেক কেটে গেল।

তবু শিউলি ফোটে। টুপটাপ্ ঝরেও পড়ে। গরমের সময় কিছু চাঁপা ফুলও ফুটেছিল এবারে। পুরোনো দেওয়ালের গায়ে মরমীর দেওয়া ঘুঁটেগুলোর ছাপ এখনো রয়েছে। কিন্তু সে আর আসতে পারেনি। অষ্টমঙ্গলার পরে সেই যে গেল, আর আসেনি। অষ্টমঙ্গলার সময়েও মরমীর মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুনেছে সবাই। তবে সেই কান্না শোনার প্রয়োজন হয়নি আট দিনের মধ্যে মরমীর চেহারার পরিবর্তন দেখে। তাছাড়া ওর কানের দুল ছিল না, গলায় হার ছিল না।

আকাশবিজয়ের বুক ফেটে গিয়েছিল। ভেবেছিল অন্তত একবার মরমী তার ঘরে আসবে। আসেনি। কোন আনন্দে আসবে? তাছাড়া সে একালের চপলাসুন্দরী। সে তো এসে বলতে পারে না নরেনকে মেরে ফেলে দে আকাশ, আমি ওর সঙ্গে সহমরণে যেতে রাজী।

এ-বংশ থেকে মরমী আর কিছু পেয়ে থাকুক আর নাই থাকুক রূপটুকু পেয়েছে। আর পেয়েছে স্পর্শকাতরতা। দুটোই এ-যুগে অচল। এ-যুগে ওই প্রদীপের আলোর মতো রূপ মৃদু হাওয়াতেই দপ্ করে নিভে যায়। আকাশ অনুভব করে, আর এক বছর পরে সে মরমীকে চিনতেও পারবে না। তখন মরমী নিশ্চিন্তে লোকের বাড়িতে বাসন মাজলেও কেউ রূপের ছিটে-ফোঁটা চেখে চমকে উঠবে না।

মরমীর বিয়ের পর থেকেই শকুন্তলা আর কল্যাণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। আগে শকুন্তলা বয়সে বড় বলে একটা 'দিদি দিদি' ভাব বজায় রাখত। বিয়ের পর থেকে গলায় গলায় বন্ধু। এক দেড় বছরের পার্থক্য কোথায় মিলিয়ে গেল। ইদানীং দুজনার মধ্যে ফিসফিসানি শুরু হয়েছে বড্ড বেশি। বিকেলের দিকে ভাঙা ছাদে উঠে পায়চারি করাও এখন ওদের প্রাত্যহিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। এ-বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো অমন হুট করে ছাদে ওঠেনি। তারা উঠেছে ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কিছু শুকোতে দিতে—যখন

আশেপাশের বাড়ির পুরুষেরা সাধারণত থাকে বাইরে কর্মক্ষেত্রে। কিংবা কোনো শোভাযাত্রা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দলবেঁধে সবাই মিলে উঠে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। তাতে একটা শক্তি পেয়েছে মনে। একা একা ছাদে উঠতে একটা অসহায়তা ফুটে ওঠে এ-বাড়ির মেয়ে বউ-এর চোখে মুখে। যেন রাজ্যসুদ্ধু সবাই গিলতে আসছে। যেন বাইরের কোনো এক পাপ গায়ে লেপটে যাবে।

কল্যাণী আর শকুন্তলার মধ্যে কোনো অসহায় ভাব বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করেনি আকাশবিজয়। দেখে ভাল লেগেছে। তবে তার ভয়, অনন্তবিজয় এসব টের পেলে ভীষণ রেগে যাবে। তাই একদিন ওদের দুজনকে হাসতে হাসতে দুমদাম করে নামার সময় সে সব কিছু বুঝিয়ে বলে সাবধান করে দেয়।

শকুন্তলা ফোঁস করে ওঠে—কেন, কোনো অন্যায় করেছি নাকি?

না। অন্যায় করবি কেন? ভালই তো করেছিস।

তবে দাদু রাগবে কেন?

এ বাড়িতে মেয়েরা এভাবে যখন তখন তো ছাদে ওঠে না। তোরা যেভাবে খিলখিল করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামিস, দাদুর নজরে পড়লে তার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠবে।

হাসতেও মানা এ বাড়িতে?

কে বলেছে মানা? তুই বড্ড পাকা হয়ে উঠেছিল। চপলা-সুন্দরী বলত মেয়েদের আদিখ্যেতা এ-বাড়িতে চলবে না।

তুমি বুঝি তার জীবিত প্রতিনিধি আকাশদা?

বাঃ, বেশ কথা শিখেছিস তো শকুন্তলা? তোরা ভুল করছিস। আমি তোদেরই দলে। এই সুবিধাটুকুতে যাতে হাত না পড়ে, আমি তাই সাবধান করে দিচ্ছি।

আমাদের জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

দাদু যদি তোদের ওপরে ওঠা বন্ধ করে দেয়?

বলে দিও, আমাদের জন্যে কিছু নতুন শাড়ি ব্লাউস কিনে দেয় যেন। তাহলে আর ছাদে উঠব না, রাস্তায় বার হতে পারব।

তখন শুধু ইস্কুল আর বাড়ি করতে হবে না।

কল্যাণী মুখখানা কঠিন করে বলে—আর হাসি পেলে তো হাসবই। কান্না পেলে কাঁদতে যখন কেউ মানা করে না এ-বাড়িতে। মেয়েদের শুধু বুঝি কান্নাতেই অধিকার?

সব্বোনাশ! তুই-ও এত কথা শিখেছিস? আমি ভাবলাম কল্যাণী বুঝি আমাদের সেই আগের কল্যাণীই আছে।

হ্যাঁরে। আমি তাই আছি। আমি বদলাতে চাই কিন্তু পারি না। কে যেন জাপটে ধরে রেখেছে। কিছুতেই এগোতে দিচ্ছে না।

শকুন্তলা বলে—ওসব ভাবের কথা ছাড়ো আকাশদা। আসলে তুমি ভীতু আর অলস। তাই পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ।

আকাশবিজয়ের সর্বাঙ্গে তড়িৎ খেলে যায়। শকুন্তলার চেয়ে সে কম করে চার বছরের বড়। এ-বাড়িতে অতবড় দাদাকে এভাবে কেউ কখনো বলেনি। ওদের সে যতটা ছোট ভাবত ততটা তো নয়ই বরং অনেক বেশি পারিণত। ওরা শুধু নিজেদের নিয়েই তুষ্ট নয় অন্যের দোষত্রুটিগুলোর দিকেও তীক্ষ্ণ নজর। নইলে তার দুর্বলতার কথা এমন সহজ ভাবে হুবহু বলে দিল কি করে?

কল্যাণী একটু হেসে বলে—একটু স্পষ্ট করে বলে ফেললে শকুন্তলাদি?

কি করব? রাগ হয়ে গেল যে। কিছু মনে করো না আকাশদা। শত হলেও তুমি আমাদের দাদা।

আকাশবিজয় হেসে বলে—তা যা বলেছিস।

ওরা চলে গেলে আকাশ ভাবে, মরমী এ-বাড়ি থেকে বিদায় নেবার পর চপলাসুন্দরীর যুগ এতদিনে বোধহয় শেষ হলো। সেই কবেকার কোম্পানীর আমলের সময় থেকে যে সমস্ত জিনিস ক্রমাগত রক্তে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, এতদিনে তার ঝাঁঝ কমতে শুরু করেছে। এবারে বোধহয় মুখোপাধ্যায় বংশের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে কিংবা আগেকার অভিজাত্যের মাদকতা-ভরা গন্ধটা উবে গিয়ে একটা সাদামাটা ঘামে-ভেজা আধুনিক আটপৌরে রূপ নেবে।

আরও কিছুক্ষণ ঝিম্ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নামার সময় আকাশ সুচিত্রা কাকীর ঘর থেকে চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পায়। ঠিক কান্না নয়, একটু ফোঁপানো গোছের আওয়াজ। বাড়ির অভিজাত্য দিন দিন নষ্ট হচ্ছে বলে সুচিত্রা কাকীর ঘুম নেই। স্বামী যাত্রাদলের রাজা কিংবা নায়ক। চেহারা যত ভালই হোক, দিন নেই রাত নেই বাসে করে, ট্রেনে চেপে, কখনো বা গো-শকটে এ-গাঁ থেকে সে-গাঁ, পায়ে হেঁটে এ-গঞ্জ থেকে সে-গঞ্জ ঘুরে ঘুরে একটা রুক্ষতা এসে গিয়েছে। ঝাঁকড়া চুলে পাক ধরেছে। সুচিত্রা কাকীর এতে আফশোষের শেষ নেই। সামনে মাইক থাকা সত্ত্বেও শীতে গ্রীষ্মে সব ঋতুতে গলা ফাটিয়ে অভিনয় করার ফলে কণ্ঠের সেই মাধুর্য উধাও হয়েছে। এখন অভিনয়ে নিত্যনূতন কিছু ঢেলে দিয়ে চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই প্রশান্তবিজয়ের। যেটুকু দেবার প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে। এখন শুধু সেগুলো ভাঙিয়ে অভ্যাস বশে চলেছে। তাই পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালায় তার ভাবভঙ্গি, হাতনাড়া, চলাফেরার মিশ্রণ ঘটে যায় আচমকা। তবে যারা যাত্রাপাগল, তারা সবক্ষেত্রে প্রিয় অভিনেতা আর উত্তেজনাই চায় শুধু। তাই প্রশান্তবিজয়ের এখনো ভাল দর। দুবছর আগেও সে কোম্পানী পালটেছে। বেনেটোলার অফিস থেকে চিৎপুরের অফিসে এখন। তবে সে পাল্টানোর পেছনে অন্য এক কারণও ছিল।

আকাশবিজয় জানে প্রশান্ত মদ খায়। এতে তার ঢাক ঢাক গুড়গুড় নেই। শকুন্তলাও জানে বাবা মদ খায়। বর্ষাকালে যখন বাড়িতে বসে থাকতে হয়, তখন সামনের দোকান থেকেই সোডা চানাচুর এনে নেয় প্রশান্ত। তবে তাতে কোনরকম বেলেল্লাপনা নেই। পাড়ায় তার দুর্নাম কখনো শোনা যায় না। বরং ভালমানুষ বলে খ্যাতি রয়েছে কিছুটা। তবু একটা দিনের কথা ভুলতে পারে না আকাশবিজয়।

মরমীর বিয়ের ঠিক আগে আগে হবে। এক সন্ধ্যায় এক

ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত প্রশান্তবিজয়ের সঙ্গে দেখা করবে বলে। দেখতে শুনতে বেশ ভালই। খুব চটপটে কথাবার্তায়। প্রশান্তবিজয় তখন বাড়ি ছিল না আকাশবিজয় ঠাকুরদালানের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাই তার সঙ্গেই দেখা হয়ে যায় মহিলার। সে, ঠাকুরদালানের পাশের যে ঘরখানি বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেখানে নিয়ে বসিয়েছিল তাকে।

ওদিকে সুচিত্রা খবর পেয়ে ঘরের মধ্যে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তার মুখ উত্তেজনায় আরক্তিম হয়ে ওঠে। শকুন্তলা তখনো এতটা পাকেনি। তাই মায়ের হাবভাব দেখে ছুটে আকাশের কাছেই এসেছিল।

আকাশ কাকীমার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল—তোমার এতটা উতলা হবার কি কারণ ঘটল ?

বুঝবি না। তোরা নিজেদের যতই বড় ভাবিস, এখনো অনেক ছোট।

তাই বলে, এক ভদ্রমহিলা কাকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন —এটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা নয়।

এই ভদ্রমহিলা কে, সেকথা বুঝতে পেরেছিল ?

এখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

তাই তো বলছি, তোরা এখনো ছোট। দেখগে কোন যাত্রাদলের সখীটখী হবে। এই বংশের একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে যাত্রাদলের সখী। ভাবতে পারিস, সম্মান কোথায় গিয়ে লুটিয়েছে। ওই মেয়েমানুষটা দেশনেত্রী নয়, সাহিত্যিকা নয় কিংবা সঙ্গীতজ্ঞাও নয়।

আগে খোঁজ নিয়ে দেখো, তিনি কে ?

এ আবার দেখতে হয় নাকি ?

সুচিত্রা কাকীর উত্তেজনা বিন্দুমাত্র উপশম হয়না। আকাশ তখন শকুন্তলাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভদ্রমহিলার কাছে যায়।

কাকা তো নেই। আপনি কি অপেক্ষা করবেন ?

হতাশ মহিলা বলে ওঠে—নেই? কখন আসবেন উনি?

কিছু ঠিক নেই।

একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন তো?

বলা যায় না। অনেক রাতেও ফেরেন।

অনেক রাতে ফেরেন? রিহার্সেলে যান বুঝি?

আকাশবিজয়ের মনটা দমে যায়। সুচিত্রা কাকী ঠিকই ধরেছে তবে। নইলে রিহার্সেলের কথা জানল কি করে?

আমরা তো জানি না কোথায় যান।

একটু ইতস্তত করে মহিলা বলে—ও। তাহলে আজ উঠি। আর একদিন আসব। আসতেই হবে।

আকাশবিজয় বলে—উনি এলে কি বলতে হবে?

বলবেন, ধূমাবতী নাট্য কোম্পানীর মুকুলরানী এসেছিল।

শকুন্তলা এতক্ষণ শান্তশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা শুনেই ধাঁ করে ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেল।

মুকুলরানী বলে ওঠে—মেয়েটি কে?

এভাবে জানতে চাওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ। তাই আকাশবিজয় প্রশ্নের জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলে—উনি ফিরে এলে আপনার কথা বলব।

মুকুলরানী তবু ইতস্তত করে। শেষে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই একসময় চলে যায়।

আর পরমুহূর্তেই প্রশান্তবিজয়ের আবির্ভাব ঘটে। আকাশ মুকুলরানীকে ডাকতে বাইরে ছুটে যেতে গেলে প্রশান্ত হাত চেপে বলে—থাক। আমি ওকে দেখেই লুকিয়েছিলাম। তোর কাকী শুনেছে নাকি?

হ্যাঁ। এতক্ষণে শকুন্তলা মুকুলরানী নামটাও গিয়ে বলে দিয়েছে।

কী মুশকিল। এই মেয়েটার জ্বালায় ধূমাবতী ছাড়লাম, তবু আঠার মতো লেগে রয়েছে। তোর কাকীকে কীভাবে যে বোঝাই।

আকাশ প্রশান্তবিজয়ের এই নির্দোষ স্বীকারোক্তিতে হেসে ফেলে বলে,—সে ভার আমার।

এ্যাঁ।

তুমি একটু পরে এসো। আমি কাকীর কাছে যাচ্ছি।

সেদিন সত্যিই আকাশবিজয় সুচিত্রা কাকীকে শান্ত করতে পেরেছিল।

বিরাট একটা সাদা রঙের প্রাইভেট কার এসে থামল একদিন বাড়ির সামনে। রাস্তার সব কিছুই এখন বাড়ি থেকে দেখা যায়। কারণ রাস্তার দিকটা ছিল গোশালা। সেটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নিয়ে চওড়া রাস্তা তৈরীর পর নতুন করে আব্রু সৃষ্টির ক্ষমতা হয়নি এই বংশের কারও। গোশালার সামনেই ছিল ঠাকুরদালান—যেটার পাশে ভোগের ঘর এখন বৈঠকখানা। আকাশ এই ভোগের ঘরের পাশে রথের মেলা থেকে কিনে আনা কয়েকটা ফুলের গাছ লাগিয়েছিল। তারই পরিচর্যায় রত ছিল। সেই সময় ওই বড় সাদা গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক নেমে সোজা এসে তাদের বাড়িতেই ঢোকে। লোকটি ঠাকুরদালানের দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। ইতিমধ্যে বাড়ির জানলায় এক আধটা মুখ উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে।

লোকটা তার দিকে চেয়ে হেসে বলে—তুমি সমরদার ছেলে হলে অবাক হবো না।

অবাক হলো আকাশবিজয়। অচেনা লোক এমন কথা বলে কি করে? তাছড়ো তার বাবা বহুদিন হলো মারা গিয়েছেন।

সে বলে—আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে আপনাকে আমি চিনি না।

ওহো, তাই তো। পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমি সত্যবিজয়। নাম শুনেছ?

হ্যাঁ, অনেকবার। প্রিন্স দ্বারিকের সময় থেকে, এ-বংশে যত

মানুষ জন্মেছে, অনেককে না চিনলেও বলতে গেলে সবার নাম জানি।

বংশগৌরব, তাই না?

না। সে-গৌরব আছেও অনুভব করি না। তবে চপলাসুন্দরী বাড়িতে থাকতে নাম না জেনে উপায় ছিল না।

হাঁ। একজন ছিলেন বটে! জীবন্ত বংশতালিকা। তবে উনিই আবার বলতেন, মশলা-বাটা শিল ধুতে ধুতে সাদা জলই বার হয় শেষে। তাই আমার মুখার্জি উপাধি পালটে যখন চর্মনাথ রাখার প্রস্তাব গেল এ-বাড়ি থেকে তখন উনিই প্রতিবাদ করেছিলেন শুনেছি।

সত্যবিজয় আর বেশি সময় নষ্ট না করে সোজা দোতলায় অনন্ত-বিজয়ের ঘরের দিকে গেল। হয়ত অনেক আগে এ-বাড়ি ছেড়েছে সে, তবু সবকিছু তার নখদর্পণে বোঝা গেল। অনন্তবিজয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রশান্ত ও পৃথ্বীবিজয়কে সেই ঘরে যেতে দেখল সে। এমন কি অমরবিজয়কেও সেখানে নিয়ে যেতে দেখল আকাশ। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হলো। তারপর একসময় সত্যবিজয় বার হয়ে এল। আকাশ তখন উঠোনের নারকেল কুল গাছের যে ডালে টুনটুনি বাসা বেঁধেছে সেই ডালটা একটু ওপর দিকে তুলে দেবার চেষ্টা করছিল।

পাশে এসে দাঁড়িয়ে টুনটুনির বাসা নজরে পড়তে সত্যবিজয় হেসে বলে—এ পাখিও কি মুখুজ্জে বংশের গোড়া থেকে আছে?

আকাশ হেসে বলে—হতে পারে। পাখির অস্তিত্ব শুনি মানুষের অস্তিত্বেরও আগে এই পৃথিবীতে। তবে এরা নতুন এসে আস্তানা করেছে।

সেটাই নিয়ম। বাঁচতে হলে আস্তানা পাল্টাতে হয়। এ বাড়ির মানুষেরা সেটা বুঝতে চায় না। আজও বুঝল না।

বুঝবে কি করে? মানুষকে তো আর ঘর তৈরি করতে হলে ঠোঁটে করে কয়েক টুকরো খড় বয়ে নিয়ে গেলেই হয় না।

জানি। আমি তোমাদের প্রত্যেককে যে টাকা দিতে চেয়েছিলাম তাতে কলকাতার আশেপাশে দুখানা কি তিনখানা ঘরের বাড়ি করে নেওয়া যেত। অথচ এই জমিটা মুখোপাধ্যায় বংশের একজনের হাতেই থাকত। কাঠাপিছু পঞ্চাশ হাজার। প্রায় আঠারো কাঠা জমি রয়েছে এখানে। হতো না?

আকাশ বিস্মিত। সত্যবিজয় তাহলে এই বাড়িটা কিনতে এসেছিল। এত টাকার কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। তাই সে বলে—হয়তো উচিত ছিল।

না। অনন্ত কাকা বললেন, আরও শরিক রয়েছে। খবর পেয়ে তারাও আসবে।

তিনি ভুল বলছেন কি?

না। তবে তাদের ভারও আমার। দলিলে সে রকম উল্লেখ থাকবে। আমি কি তোমাদের ঠকাবো?

সত্যবিজয়কে রীতিমত অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো। অসন্তুষ্টির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সে হলে সত্যবিজয়ের প্রস্তাব সমর্থন করত। দুতিনখানা ঘরের নিজের বাড়ি। হয়ত বাসে চেপে কিংবা ট্রেনে চেপে দুএক স্টেশন আসতে হতো।

আমি আপনার সঙ্গে একমত। বড়জোর ভেবেচিন্তে টাকা পয়সার একটু এদিক ওদিক করা যেতে পারত। এ-বাড়ি টিকিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই।

তবে?

আপনি কিছুদিন পরে আবার আসুন না।

আমি নিশ্চয় আবার আসব। ভয় হয় অনন্ত কাকা বাইরের কারও সঙ্গে পাকাপাকি না করে ফেলেন। তুমি একটু দেখো। এক কাজ করো না। আমাদের বাড়িতে একদিন এসো। তোমার কাকীমা রয়েছেন সেখানে। আর এক বোনও রয়েছে।

ঠিক আছে। দেখব।

মনে মনে আকাশবিজয় ভাবে 'কুহকিনীর' ফাঁদে সে আর পড়তে:

চায় না। যা কিছু কথাবার্তা অনন্তবিজয়ের চুন-সুরকী খসে যাওয়া বৃহৎ ঘরটির মধ্যে হওয়াই ভাল।

সত্যবিজয় চলে গেলে আকাশ জীবনে প্রথম মোটা টাকার অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে। একটু স্বপ্নও দেখে নেয়। আপাতদৃষ্টিতে চার ভাগ হওয়া উচিত সত্যবিজয়ের টাকা। সে তো অনেক টাকা। হঠাৎ ঘোটনের মা শোভনা পিসির কথা মনে পড়ে যায়। তারপর একে একে সধবা বিধবা অনেক পিসির অস্পষ্ট মুখ ভেসে ভেসে ওঠে। সে একটু হতাশই হয়। স্বপ্ন না দেখাই ভাল। হিন্দুধর্ম এযাবৎ কাল সেই শিক্ষাই দিয়েছে। হিন্দুদের স্বজাতি নিয়ে যে সব নিয়ম-কানুন হয়েছে স্বাধীনোত্তর দেশে তাও একই জিনিস শেখায়। সংসার মায়া প্রপঞ্চ মাত্র। মুখুজ্জে পরিবারের সঙ্গে অনেকটা খাপ খায় এই দর্শন।

গঙ্গা যতই শুকিয়ে যাক, ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে গঙ্গার পাড় মোটামুটি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা আছে। সামনে গঙ্গা হার্ডল্‌রেস দিচ্ছে। কত বাধা কত বিপত্তি। উৎসমুখ থেকে তার ধারাবাহিকতা প্রায় বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে, নানান কারণে সেদিন আসবেই, যখন গঙ্গা পার হতে হলে প্রথম ও দ্বিতীয় সেতুর প্রয়োজন হবে না হবেনা স্টীমার বা নৌকোর। হেঁটে পার হবে সবাই। কিন্তু তার জন্যে কজনের রাতের নিদ্রা টুটে গিয়েছে? কারও না। যা হবার তা হবেই। কেউ ভাবে না। এককালে যখন গঙ্গার ওপর প্রথম সেতুও হয়নি, তখন যে জগন্নাথ ঘাটে অবধি বড় বড় জাহাজ যেত, একালের কেউ জানে না। তাই অভাব বোধ নেই। ক্যালকাটা জেটিতে সারি সারি জাহাজ লাগানো থাকত, এখন থাকে না। কেউ হা-হুতাশ করেনা সেজন্যে। তেমনি গঙ্গা অদৃশ্য হলেও, কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না। আর কবে কি হবে, সেকথা ভেবে, ডিপ্রেশানে ভোগার বান্দা সবুজ রক্তের তরুণ তরুণীরা কখনই নয়। একটু সুশীতল ছায়া, একটা বেঞ্চি, দশ বর্গমিটারের একটু নির্জনতাই যথেষ্ট

তাদের পক্ষে : গোয়ালিয়র টুম্ব-এর ওপরটুকু প্রথমে দখল করতে পারলে তো কথাই নেই। ওর ওপরটুকু অনেক লায়লা-মজনু, রামী-চণ্ডীদাসের পুণ্য চরণস্পর্শে ধন্য। স্থানমাহাত্ম্য অপরিসীম।

গঙ্গা তার অস্তিত্ব হারাক ক্ষতি নেই, অনেক বংশ মর্যাদা মুখ থুবড়ে পড়ে যাক দেখার দরকার নেই। এখানে যে স্রোত আছড়ে পড়ছে, তার শক্তি অপ্রতিহত, তার তারুণ্য চিরস্থায়ী। ভৌগোলিক পরিবর্তনে কিংবা সভ্যতার উত্থান-পতনে তারুণ্যের স্রোত স্তব্ধ হয় না। সে স্রোত চিরপ্রবাহমান।

অচ্যুত এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলে--এখানে বসি।

শকুন্তলার মুখ গরমে উত্তেজনায় টুক্‌টুক্‌ করছে। সে বলে—এই উঁচুতে?

এই তো ভাল। কী সুন্দর হাওয়া বইছে।

হ্যাঁ।

একটু দূরের তরুণ-তরুণীকে দেখিয়ে অচ্যুত বলে ওখানে ওরা বসেছে বটে, আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না।

মাকে বলেছি, মঞ্জুর বাড়ি যাচ্ছি। মঞ্জু যদি আমাদের বাড়িতে যায়?

যাবে না।

কি করে বুঝলে?

আমি বুঝতে পারি। সেদিন সন্ধ্যায় দেখলে না? কী বলে ছিলাম?

মোটেই না মিষ্টার। কল্যাণী ঠিক দেখেছে।

কখনো না। দেখলে একবার অন্তত পেছনে ফিরে তাকাতো। যতক্ষণ ওকে দেখা যাচ্ছিল, আমি তাকিয়ে ছিলাম। একবারও পেছনে তাকায়নি।

ওকে চেনো না। ও আমাদের অনেক আগেই দেখে নিয়েছে।

কি করে বুঝলে?

শকুন্তলা গর্বভরে বলে,—ও যে মেয়ে।

অচ্যুত কথাটার মানে বুঝতে না পেরে শকুন্তলার মুখের দিকে

চায়। আর চেয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে যায়। শকুন্তলা প্রথমে অতটা লক্ষ্য করে না। প্রথম অভিসারে বার হয়ে সে চঞ্চল। শেষে খেয়াল হলে বলে—

এই কি দেখছ আমার মুখের দিকে!

এ্যাঁ?

শকুন্তলা খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, কী দেখছিলে অমন করে?

জান শকুন্তলা, তুমি দেখতে না, দারুণ।

যাঃ, এটা আবার একটা কথা হলো নাকি?

কথা নয়, মানে? সাংঘাতিক কথা। কন্ব মুণির আশ্রমের সেই শকুন্তলার কথা মনে আছে?

তাকে আমি দেখিনি।

বাঃ, দুষ্মন্তের বউ গো। চেনোনা?

তাকে আমি দেখেছি?

না, তা দেখোনি। আমি তার কথা বলছি। সে তোমার মত সুন্দরী ছিলকিনা সন্দেহ আছে। সাইড বাই সাইড তোমাদের দুজনাকে দাঁড় করালে তুমি বিউটি কম্‌পিটিসানে ফার্স্ট হয়ে যেতে।

কী আবোলতাবোল বকছো।

আবোলতাবোল মানে? বেট হয়ে যাক।

তুমি একটা পাগল। কি, ক'রে বেট্ হবে? ওই শকুন্তলাকে কোথায় পাবে?

তা ঠিক!

আকাশদা আবার বলে, তুমি নাকি পৃথিবীটাকে ভাল ভাবে চেনো।

ঠিক বলে।

সেই শকুন্তলার দরকার নেই। মরমীদির বিয়ের আগের কথা কথা মনে আছে?

থাকবে না কেন?

কেমন দেখতে ছিল।

উনি তো দিদি। বয়সে তেমন বড় না হলেও দিদি বলে ভেবেছি।

তাই বলে রূপ থাকবে না?

বুঝবে না শকুন্তলা, দিদির রূপ অন্য দৃষ্টিতে দেখে মানুষে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, তাই।

গঙ্গার ওপর সূর্যের সামান্য তির্যক দৃষ্টি। ঘোলা জল চিক্‌চিক্ করছে। হাসতেও পারে, কিংবা যন্ত্রণায় দাঁত বার করতে পারে মা-গঙ্গা। অনেক দূরে একটা ড্রেজার গঙ্গার বুক আঁচড়ে তার নেভিগেবল চ্যানেল মোটামুটি ঠিক রাখার বৃথা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। স্যাণ্ডহেড অবধি কত ড্রেজার যে এইভাবে কুরেকুকে খাচ্ছে ঠিক নেই। কিন্তু গঙ্গার বুকের এই স্ফীতি সাধারণ নয়, ম্যালিগন্যাণ্ট জাতের। এর হাত থেকে নিস্তার নেই। গঙ্গাধারা স্তিমিত। সবকিছুকে ধুয়ে মুছে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে অর্পণ করার মত বলিষ্ঠতা অভাগিনীর নেই।

অচ্যুত বলে,—আকাশ জানে?

কি?

এই তুমি আর আমি—

আকাশদাটা গোবেচারা। নিশ্চয় জানে না।

আকাশ গোবেচারা?

নয়তো কি?

ভুল বুঝেছ শকুন্তলা। সে ভাবুক প্রকৃতির হতে পারে, কিন্তু গোবেচারা সম্ভবত নয়।

বাব্বা, বন্ধুর ওপর খুব যে টান দেখছি। বড় বড় কথা বলছ।

আকাশ আমাদের বোধহয় সন্দেহও করে না, তাই নয়?

আমি তো বললাম, ও অতশত বুঝতে পারে না।

কল্যানী দেখেছে বলছ। আকাশকে বলে দিতে পারে?

না। তোমার ভয় করছে?

অচ্যুতের সামনে তার বাবার মুখ ভেসে ওঠে। এ-বাড়ির ওপর বাবার বিরাট শ্রদ্ধা। এ-বাড়ির মেয়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়েছে, জানতে পারলে বাড়ি থেকে বার করে দেবে। তবু, সে পারে না। শকুন্তলা যখন কিছুই বুঝতো না, জানতো, কত চেষ্টা সে করেছে নিজেকে সরিয়ে নিতে। আকাশ তার বন্ধু, এটাই যথেষ্ট। কিন্তু পারেনি, কিছুতেই পারেনি। শকুন্তলা যেন ও বাড়ির কেউ হয়েও স্বর্গের কিছু, যাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়, ছোঁয়া যায় না। তারপর একদিন—। সে হঠাৎ শকুন্তলার চোখে কিসের এক ভাষা পড়তে পারল। সেই ভাষা ছিল মুহূর্তের চকিত ভাষা। সে চমকে উঠেছিল। তার বুকের ভেতরে সৃষ্টি হলো গঙ্গায় বান আসার পরে যে রোলিং চলতে থাকে, সেই রকমের কিছু। কিছুতেই থামতে চায় না। অমন রোলিং-এ ডিঙি নৌকো বজরা থেকে শুরু করে বড় লঞ্চ অবধি ডুবে যায়। সে তো কোন্ ছার্। এতদিন তার ভেতরে একটা প্রয়াস ছিল, সরে যাবার জন্যে, সে যে লড়ছিল ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল সেদিনের পরে সব বন্ধ হয়ে গেল। পুরোপুরি আত্মসমর্পণ।

কী ভাবছ অত?

কত কি। ভাবছি আমাকে তুমি বেছে নিলে কেন শকুন্তলা।

পছন্দ হলো তাই।

আমি মোটেই দেখতে ভাল নই। তাছাড়া—

বলে যাও।

আমি তো ব্রাহ্মণ নই।

অত ভাবিনি।

এখন ভাব?

এখন ভেবে কি লাভ?

তোমার বাবা, তোমার মা—

বাবার জন্যে ততটা ভাবিনা। মায়ের জন্যে একটু ভাবনা হয়। মা মানতে পারবে না।

তবে?

তবে কি ?

তবু ?

তবু কি ?

থামছ না ?

শকুন্তলা বিস্মিত হয়ে বলে,—তুমি আমাকে থামতে বল।

না। কখনই নয়।

তবে ?

আমি বলছি কি, আমার থামার ক্ষমতা নেই। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে—

থাকলেই বা কি ? আমার নিজের মতামত নেই ?

সর্বনাশ। মুখুজ্জে বংশের মেয়ের মুখে এই কথা ?

সূর্যে একটু লাল রঙ ধরেছে। ভাটা চলছে। জল স্বাভাবিক গতিতে সাগরের পানে বয়ে যাচ্ছে। নম্বর দেওয়া দিশি নৌকো পাড় ঘেঁষে চলছে দু একটা। দূরে, বোধহয় খিদিরপুর ডকের লক-গেটের কাছে কোন জাহাজ ভেঁপু দিল। কাঁপতে কাঁপতে ভাসতে ভাসতে সেই শব্দ এলো।

একটা অসঙ্কোচ কণ্ঠস্বর—দাদা একটা কথা বলব ?

পাশে অচ্যুতেরই বয়সী একটি করুণ মুখ দেখতে পায় ওরা।

বলুন।

নীচে একবার চেয়ে দেখুন, জায়গা নেই।

অচ্যুত বুঝতে না পেরে নীচের দিকে তাকিয়ে অবাক। জোড়ায় জোড়ায় সব বসে রয়েছে বেঞ্চে, ঘাসে, পাড়ে, পেছনে চক্ররেলের লাইনের সীমানার ধারেও।

অচ্যুত ছেলেটির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

ছেলেটি বলে—আপনাদের তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আমি দেড় ঘণ্টা ওয়েট করেছি। তারও আগে আপনারা এসেছেন। আমাদের একটু চান্স দেবেন প্লীজ ?

অচ্যুতরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে একটু দূরে একটি তরুণী হাসি হাসি

মুখে শকুন্তলার দিকে চেয়ে রয়েছে।

শকুন্তলাই আগে উঠে পড়ে বলে,—সরি।

অচ্যুত বলে,—কিন্তু আমাদের যে কিছুই কথা হলো না।

ছেলেটি বলে,—জানি। তাই অনুরোধ করছি।

শকুন্তলা বলে,—আপনারা বসুন।

ছেলেটি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চেয়ে তরুণীটিকে ডাকে, —এসো কুন্তলা।

অচ্যুত বলে,—কি নামে ডাকলেন ওঁকে?

ছেলেটি বলে,—ওর নাম কুন্তলা।

অচ্যুত শকুন্তলাকে দেখিয়ে বলে—এর নাম কি জানেন?

না। কি করে জানব!

একটা 'শ' বসিয়ে দিন শুধু।

ছেলেটি বুঝতে পারে না।

অচ্যুত বলে—শকুন্তলা।

সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। সেই হাসি গঙ্গায় স্রোতের সঙ্গে মিশে কুলকুল করে চলতে থাকে। সেই হাসি সীমিত গঙ্গার জলরাশির সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অসীম সমুদ্রে গিয়ে পড়বে।

অদ্ভুত একাকীত্ব নিয়ে এ-বাড়িতে রয়েছে পৃথ্বীবিজয়। কল্যাণীর জন্মের কিছুদিন পরেই তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তখন বলতে গেলে পরিপূর্ণ যৌবন। দীর্ঘসুঠাম চেহারা—প্রশান্তবিজয়ের চেয়েও সুদর্শন। শত সহস্র অনুরোধ এলো দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্য। পৃথ্বীবিজয় উদাসীন ভাবে সেই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এমন ভাবে সব প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল, যে কেউ আর তাকে ঘাটাতে সাহস পায় নি। যদি খুব ভদ্র ভাবে হাসিমুখে বিয়ে করতে অস্বীকার করত সে, তাহলে আশা ছাড়ত না কেউ। কারণ ওই হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকে এক ধরনের লজ্জা, যা একটু পেড়াপীড়িতে সকালের কুয়াসার মত মিলিয়ে যায়। আবার যদি রেগে উঠত পৃথ্বীবিজয়

তাহলে তখনকার মত সরে গিয়ে আবার ফিরে আসত সবাই প্রস্তাব নিয়ে। কারণ সবাই জানে, অতিরিক্ত ক্রোধ অনেক সময় দুর্বলতার ছদ্মবেশ। কিন্তু পৃথ্বীবিজয় ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এ ধরণের মানুষের কাছ থেকে কিছুই আশা করার থাকে না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র-কন্যার ভার নিজেই নিয়েছিল পৃথ্বী। অমর-বিজয়ের স্ত্রী শতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। পৃথ্বীবিজয় অমরবিজয়ের চেয়ে বয়সে ছোট। অমরবিজয়ের একটা টান ছিল তার ওপর। তাছাড়া পৃথ্বীর ছেলে দ্বিগ্বিজয়কে সে নিজের ছেলের মতই, ভালবাসত। দ্বিগ্বিজয়ের চেহারায় মধ্যে মুখোপাধ্যায় বংশের সৌন্দর্যের সঙ্গে বাড়তি ছিল বুদ্ধির দীপ্তি আর বলিষ্ঠতা। দিগ্বিজয়কে নিয়ে পৃথ্বীয় চেয়েও অমরবিজয়ের মনে ছিল একটা গর্ববোধ। তাই পৃথ্বীর স্ত্রী বিয়োগ হলে সে নিজের স্ত্রীকে বলেছিল,—পৃথ্বী যেন একা একা সব করতে না যায়। জীবনে যে লোকটা কখনো এক গ্লাস জল ভরে খায় নি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে প্রথম যেদিন উনোন ধরাতে যায় সেদিন অমরবিজয়ের স্ত্রী ছুটে এসে বলেছিল,—ঠাকুরপো, ওটা আমিই ধরিয়ে দেব রোজ।

তোমার কষ্ট হবে বৌঠান।

আমাদের এটা অভ্যাস। একটার জায়গায় দুটো ধরাবো। তোমার অভ্যাসই নেই ভাই।

বৌঠানের কথার ওপর পৃথ্বী সাধারণত কথা বলে না। এ-বাড়িতে ওটা ঠিক চালু নেই। অমরবিজয়ের স্ত্রী জানত তার স্বামীর যদি ভদ্রগোছের কোন রোজগার থাকত তাহলে, পৃথ্বীকে আর তার দুই ছেলেমেয়েকে রান্না করা খাবার দিতে পারত। কিন্তু সেটা ছিল না। অমরবিজয় বাঁধাধরা কিছু করত না। কী যে করত, কেউ খবর রাখে না। তবে টুকটাক কিছু করত নিশ্চয়, নইলে সংসার চলত কী ভাবে। কিন্তু তার ওপর নির্ভর করার উপায় ছিল না।

দিগ্বিজয়ের মৃত্যুতে অমরবিজয়ের যেমন মাথা খারাপ হলো, পৃথ্বীরও তেমনি এ্যাসেম্বলি হাউসের চাকরীটি গেল। এতবড় একজন

ভয়াবহ নকশাল নেতার পিতা হয়ে কী করে থাকে চাকরীটি ? তার অপরাধ ! পুলিশের শত অনুরোধেও দিগ্বিজয় যখন যুদ্ধ করছিল তখন পৃথ্বীবিজয় লাউডস্পীকারে —দিগ্বিজয়, আত্মসম্পর্ণ কর বলতে অস্বীকার করে। ছেলের ব্যাপারে পুলিশকে বরাবর অন্ধকারে রেখেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি কি আপনার ছেলের ক্রীয়াকলাপের খবর রাখতেন ?

হ্যাঁ।

লাফিয়ে উঠে আশ্চর্য হবার ভান করে বলেছিল সেই কর্মচারী—কী বললেন ? রাখতেন ?

রাখতাম।

আশ্চর্য, তবু খবর দেন নি ?

খবর দেব ? কাকে ?

আমাকে, মানে সরকারকে—

তা দিতে যাব কেন ? ও ওর নিজের পথ বেছে নিয়েছিল। ওই পথেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল আসবে, বিশ্বাস করত।

ওই পথে দেশের মঙ্গল ? আপনার ছেলে না হয় ছেলেমানুষ ছিল, তাই বলে আপনার বয়স তো কম হয়নি। আপনিও বিশ্বাস করতেন ?

পৃথ্বীবিজয় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। ওর বিশ্বাসটাই আসল। তাছাড়া ছেলেমানুষ হলেও ও বোকা ছিল না।

পৃথ্বীবিজয়ের চাকরী গেল। অথচ কত সুনাম ছিল তার অফিসে। তার সুন্দর চেহারা, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কথাবার্তায় সবাই মুগ্ধ ছিল। বিধানসভা ভবনে তার নাম ছিল রাজাসাহেব। এমনকি মন্ত্রীরাও সে-নামে ডাকতেন। একজন মন্ত্রী তো একদিন প্রশ্ন করে বসলেন—আচ্ছা রাজাসাহেব এতবড় ডাকনাম ধরে ডাকতে বাড়ির সবার অসুবিধা হয় না ? বাড়িতে কি আপনার গুরুজনেরা শুধু "রাজা" বলে ডাকেন ?

পৃথ্বী প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে বলে—ও নাম শুধু এই এ্যাসেম্ব্লিতে স্যার। সরকারী কাগজপত্রে আর বাড়িতে আমার আর এক নাম।

ও তাই বুঝি? এ নাম এখানে কে দিয়েছিল'

সে অনেক আগের কথা। আমাদের একজন সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি একদিন চীফ হুইপের ঘরে হঠাৎ খেয়ালের বসে "রাজাসাহেব" বলে ডেকে উঠেছিলো আমাকে। সেই সময় পার্টির খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল। মেজাজে ছিলেন সবাই। তাই ওই নামটা চালু হয়ে গেল। ফাউল-কারীটা সেদিন খুব টেস্ট্‌ফুল হয়েছিল।

মন্ত্রী হেসে চলে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, স্ত্রীর মৃত্যুর পরই পৃথ্বীবিজয় ঠিক করে ফেলেছিল, ছেলে মেয়েকে সে তাদের নিজের পথে চলতে দেবে। এই বংশের অন্য সব ছেলেমেয়েদের বংশের অতীত-কাহিনী শুনিয়ে মনের মধ্যে কুসংস্কার ঢুকিয়ে বাড়তে দেওয়া হয় না। সেভাবে দিগ্বিজয় আর কল্যাণীকে মানুষ সে করবে না। কম্পুটারকে যেমন তথ্য সরবরাহ করা হয়। সে-ও সাধ্যমত ওদের সব রকমের তথ্য জানিয়ে দেবে। ওরা নিজেদের বিচারে বেড়ে উঠবে। এক একটা বয়স্ক "বন্‌সাই" বানিয়ে কোন লাভ নেই। স্ত্রীরও নিজস্ব একটা মতাদর্শ নিশ্চয় ছিল। সেটা কি, জানার অবকাশ পাওয়া যায়নি। তবে সর্বকিছুর ওপর মাতৃস্নেহটা এরা পেত। আর এই মাতৃস্নেহ অনেকটা "ইউরিয়ার" কাজ করে, এটা জানা কথা। সেইটুকু অভাব এদের জীবনে থেকে যাবে বলে পৃথ্বীর মনে হয়েছিল। তবু দিগ্বিজয় যখন বড় হয়ে উঠতে লাগল, অমরবিজয়ের মত অতটা প্রকাশ্যে না হলেও, প্রচ্ছন্ন ভাবে তার মনের মধ্যেও একটা গর্ব-ভাব মাঝে মাঝে দোলা দিত। অমরবিজয় বয়সে তার চেয়ে বড় হলেও, বিয়ে করেছিল অনেক পরে। তাই পৃথ্বীর প্রথম সন্তানকে সে পিতৃস্নেহের বেশ কিছুটা ভাগ পাকাপাকি-ভাবে দিয়ে ফেলেছিল। আর পৃথ্বী লক্ষ্য করেছে মরমী চপলাসুন্দরীর

কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও অমরবিজয় কিছু বলেনি। অথচ দিগ্বিজয় সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই শান্তভাবে তাকে ডেকে বলেছে—তুই ওসব গল্পের মধ্যে থাকিস না। ওরা পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছে। তুই এগিয়ে যাবি।

দিগ্বিজয় জ্যেঠামশায়ের দিকে কিছুক্ষন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে পারত। ঘাড় কাত করে রাজী হয়েও অল্পবয়সে এক এক সময় বলে ফেলত,—ওদের সব কথাই কি ফেলনা? মাঝে মাঝে একটু শুনতে হয়।

অমরবিজয় হেসে সমর্থন জানিয়ে বলত—তা ঠিক।

এতটা স্নেহ ছিল বলেই তার ফল ভোগ করতে হয়েছে তাকে সবচেয়ে বেশী, যা পিতা হয়ে পৃথ্বীবিজয়কেও করতে হয়নি। পৃথ্বীর মত বলিষ্ঠ ধাতের সে ছিল না কোনদিন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই পৃথ্বীবিজয়ের মনে হতো, পৃথিবীটা আর আগের মত নেই। এতদিন সাধআহ্লাদ বলে একটা জিনিষ ছিল, এখন সেটি বিদায় নিল। পড়ে রইল শুধু কর্তব্য। সকালে উঠে শিশু কল্যাণীর পরিচর্চা করা, দিগ্বিজয়ের পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দেওয়া। সেই ফাঁকে বৌঠান গনগনে উনোন ধরিয়ে এনে রান্নাঘরের মধ্যে রেখে ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে যেত। চাল ধোয়া রোজই রেখে দিত পৃথ্বীবিজয়। তারপর ওদের স্নান করিয়ে, নিজে স্নান করে বাকী টুকটাক কিছু রেঁধে ওদের খাইয়ে নিজে খেয়ে নিয়ে অফিসে ছুটতে হতো। যাওয়ার সময় কল্যানীকে বৌঠানের ঘরে পৌঁছে দিয়ে ছেলেকে ইস্কুলের গেটের কাছে ছেড়ে অফিসে যেত। এ্যাসেমব্লি চলার সময় একটু অসুবিধা হতো। বেশ সকাল সকাল হাজির হতে হতো বেশীরভাগ দিনই। অন্য সময় "রাজাসাহেবের" মত গেলেও ক্ষতি ছিল না। সে শুনেছে, আর একজন সত্যিকারের রাজা, করনিকের কাজ করে গিয়েছেন ওখানে। তাঁদের যৌতুক উপাধি ব্রিটিশ আমলে রাজাই ছিল। টুকটুকে রঙ ছিল নাকি ভদ্রলোকের। তবে অরাজা-সুলভ একটি নেশা ছিল।

অবিরত সুগন্ধি জর্দাসহ পান খেতেন তিনি। বিতরণও করতেন। স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী যুগ ছিল তখন। গাঁ থেকে উঠে আসা অনেক এম. এল. এ তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলতেন। এখন আর সেসব দিন নেই। নেই বলা যায় না। পৃথ্বী জানে, পুরোমাত্রায় আছে। যে রাজার উপাধির সঙ্গে ঐশ্বর্য আর শক্তি মিশ্রিত রয়েছে সে-ও বংশপরম্পরায় রাজনগিরি চালিয়ে যেতে পারে। পৃথ্বীবিজয় পড়েছিল। গিরিশ ঘোষ কিংবা অন্য কোন কেউ লিখেছিলেন, 'ভারতের মর্ম ধর্ম।' পৃথ্বীবিজয় সেটা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে ভারতে বেশ ভারী সংখ্যক মানুষের মানসিকতা যে প্রবলের খোসামোদ করা, এটা হৃদয়ঙ্গম করেছে সে বহুদিন থেকেই। তাই তাকে 'রাজাসাহেব' বলে ডাকলে ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করত। আগের প্রকৃত সেই করনিক-রাজার মত এক গাল পান-খাওয়া হাসি সে হাসতে পারত না।

পৃথ্বীবিজয় বুঝতে পারে তার এই ধরনের মানসিকতা যেকোন ভাবে হোক দিগ্বিজয়কে প্রভাবিত করেছিল। পিতাপুত্র মুখ ফুটে কখনো এ-ধরনের আলোচনা করেনি। তবু দুজনা দুজনের এত কাছাকাছি ছিল যে বাঙ্‌ময় হয়ে না উঠলেও, অনেক কিছু ভাবের আদান-প্রদান নিঃশব্দে তাদের মধ্যে হয়েছে—যেমন এখন হচ্ছে তার আর কল্যানীর মধ্যে।

অমরবিজয়ের মত ভারসাম্য না হারালেও, পৃথিবী তাকে আরও কিছুটা ঐকল্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বৌঠান এবং পরে মরমী, কল্যানীর দেখাশোনা করত বলে, হয়ত এটা সম্ভব হয়েছিল। নইলে, এতটা ছাড়াছাড়া ভাবে কিছুতেই সে থাকতে পারত না। দিগ্বিজয়ের মৃত্যুর পরে বুকের মধ্যে তৈরী হয়েছিল একটা বিরাট ব্ল্যাক-হোল। আকাশবিজয় তার মুখের দিকে কীভাবে যেন চেয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরে এসে পাশে বসে সঙ্গ দিয়ে যায়। আকাশবিজয়কে এত আপন মনে হয়। ওর ভেতরে একটা "পিতা" রয়েছে। পৃথ্বীবিজয়ের সত্যিই এমন আজব কথা মনে হয়েছে। এত কম ওর

বয়স, অথচ এত চিন্তাশীল। সে লক্ষ্য করেছে, কল্যানী আকাশকে ততটা পছন্দ করেনা। যদিও এককালে আকশদার হাত ধরে ইস্কুলে যেতে না পারলে সে গুম্ হয়ে বসে থাকত। ভুলে গিয়েছে সেসব দিনের কথা। কারই বা মনে থাকে। কল্যানীর কথাবার্তায় আকাশের চোখে একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, কীভাবে সে, কে জানে। আকাশের ওই স্নেহই কি কল্যানীকে উগ্র করে তোলে? সে কি মনে করে, আকাশ তার মনের দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দিতে চায়।

অমরবিজয়ের মাথাটা একটু বেশি খারাপ হয়েছে কিছুদিন হলো। এমনই হয়। এক এক সময় প্রায় স্বাভাবিক। কখনো অসংসগ্ন কথা বেশী বলে। কখনো একেবারে পাগল। তবে হিংস্র হয়নি কখনো। ক্ষেপে গিয়ে গালাগালিও দেয় না কাউকে। আজ দুদিন সে বারবার ঘর থেকে বার হয়েএসে চেঁচিয়ে ডাকছে মরমীকে। খেয়াল নেই মরমী স্বামীর ঘর করে। মরমীর মা সুচিত্রা কাকীর কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে—নিশ্চয় মেয়েটার ভালমন্দ কিছু হয়েছে। ও এমন তো করে না কখনো। মেয়েকে বড্ড ভালবাসে।

মন খারাপ করো না। রাতে হয়ত ভাল ঘুম হয়নি।

কদিন থেকেই ঘরের মধ্যে বসে বারবার মরমীর কথা বলছে। আজ বাইরে বার হয়ে এসেছে।

আর অদ্ভুত ব্যাপার। দুপুরে একটা চিঠি এলো মরমীর। বিয়ের পর এই প্রথম। সে চিঠির গায়ে তার ইতিহাস লেখা না থাকলেও খামের চেহারা দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় অনেকদিনের আপ্রাণ চেষ্টার পর মরমী কোনোরকমে দুলাইন লিখতে পেরেছে। তারপর কত লুকিয়ে সেটা পোষ্ট করেছে কাউকে দিয়ে! লিখেছে আকাশকেই।

'আকাশ, বাবাকে কী আর লিখব। আমি বোধহয় বাঁচব না। দুঃসহ অত্যাচার। টাকা চায় শুধু। বাপের বাড়ি থেকে আনতে বলে। দিতে পারি না—তাই লাথি মারে। লাথি খেতে আমি সব

সময়েই প্রস্তুত। কারণ এটাই সবচেয়ে লঘু দণ্ড। অন্যগুলো বিভীষিকা। ইতি মরমী।'

চিঠিখানা আকাশ কাউকে দেখায় না। স্থির করে ফেলে মরমীর ওখানে যাবে সে। একা যাবে? না, অচ্যুতকে সঙ্গে নেবে। অচ্যুত আজকাল ঘনঘন এ-বাড়িকে আসে। সে না থাকলেও আসে। শকুন্তলার সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় খুব।

তাকে মরমীর বাড়িতে যাবার কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যায়। রবিবারে মরমীর বরের জুটমিলে ছুটি থাকে। সেদিন যাওয়াই ভাল।

মরমীর মাকে চিঠির কথা না বললেও, সুচিত্রা কাকীকে বলেছে আকাশ। আর বলতে চেয়েও বলতে পারেনি নিজের মাকে। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক কম। বাবার মৃত্যুর পর মা যেন নিজেকে সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে আপন মনে থাকে। তবে দাছুর যতটুকু দেখাশোনা করা দরকার সেটুকু করে। ছুবেলা দাছু এবং তার জন্যে সাদামাটা রান্না করে দেয়। তাদের হেঁশেলে আমিষ হয় না বাবা মারা যাবার পর মায়ের কষ্টে অভিভূত হয়ে দাছু নিজেও মাছমাংস ইত্যাদি ছেড়েছে। সুতরাং তার নাতিটার প্রলোভন থাকলেও কোনো উপায় নেই। নেহাৎ কখনো সখনো বাড়িতে এর-ওর হেঁশেল থেকে ডাক পড়ে। তবে কারও প্রাচুর্য নেই বলে ওসব আঁশটে গন্ধে আশ মেটে না। অচ্যুত এক আধবার খাওয়ায় বটে। মিষ্টান্ন বিক্রেতার বংশধর বলেই বোধহয় ওর চপ কাটলেট ইত্যাদির ওপর বেজায় ঝোঁক এবং আকাশবিজয় তরে ছেলেবেলার বন্ধুই শুধু নয়—বংশানুক্রমে তাদের সম্পর্ক। এ ছাড়া অচ্যুতের ইদানিং তাকে খাওয়াবার প্রবণতার দিকে বেশি ঝোঁক দেখে এবং তার একান্ত অনুগত দেখেও আকাশবিজয় এখনো বুঝতে পারেনি এই বিগলিত ভাবের পেছনে কী কারণ থাকতে পারে।

যাই হোক, মরমীর কাছে যাওয়ার আগে একবার অমরবিজয়ের ঘরের দিকে গিয়ে মরমীর মাকে ডাকে।

কি আকাশ ?

ভাবছি, কাকা যেরকম অস্থির হয়ে উঠেছেন, একবার মরমীর ওখান থেকে না হয় ঘুরে আসি।

যাবে তুমি ? সত্যি ? মরমী তোমারই তো খেলার সাথী ছিল। হ্যাঁ, একবার গিয়ে শুধু চোখের দেখা দেখে এসো। আমি আর পারি না।

ওর শ্বশুর বাড়ির ঠিকানাটা দেবে ?

কাকীমা খুঁজে খুঁজে মরমীর বিয়ের কার্ডখানা নিয়ে আসে। পঞ্চাশখানা কার্ড ছাপা হয়েছিল মনে আছে আকাশের। মরমীর মামাই এ ব্যবস্থা করেছিল পাড়ার 'সানলাইট' প্রেসে।

নিচে অচ্যুত অপেক্ষা করছে। আকাশ একটা কাগজ যোগাড় করে ঠিকানাটা টুকে নেয়। তারপর নিচে নেমে এসে দেখে অচ্যুত শকুন্তলার সঙ্গে গল্প করছে। আকাশের মনে হয় এইভাবে ঠাকুরদালানের কাছে এসে অচ্যুতের সঙ্গে শকুন্তলার গল্প করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। কারণ বেশ কিছুদিন থেকে শকুন্তলা শাড়ি পরে। দেখতেও বেশ বড়সড়ো। এ-বাড়ির সব মেয়েরই অমন বাড়ন্ত গড়ন। তার ওপর শকুন্তলা সুচিত্রা কাকার মেয়ে। চিন্তাহরণের নাতির সঙ্গে মেয়ে গল্প করছে শুনলে বোধহয় ক্ষেপে উঠবে।

চল অচ্যুত।

ওরা বার হয়ে পড়ে। জীবনে কখনো লিলুয়ার ওইখানে নামতে হয়নি আকাশের। বেলুড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু কারও বাড়িতে নয়। মন্দির দেখে সোজা চলে গিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। অচ্যুতকে দেখেও মনে হলো না এদিকে বিশেষ এসেছে বলে। তবে সে আত্মবিশ্বাসী।

আন্দাজমতো এক জায়গায় নেমে পড়েই অচ্যুত বলে ওঠে—ওই যাঃ। মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে রে।

কি ভুল হলো আবার ?

বাঃ, বোনের শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিস। তাও আবার জীবনে

প্রথম। মিষ্টি নিতে হবে না ?

আকাশবিজয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। অচ্যুত বেঠিক কিছু বলেনি। তার অত টাকা নেই। অচ্যুত এখন কিনে দিলেও, সুচিত্রা কাকী কখনো দেবে না। দাতুর কাছে চাইলে হয়ত দিতে পারত। অর্থাৎ এ-বাড়িতে একমাত্র দাতুই বসে খায় অর্থাৎ বসে থেকেও তুবেলা তুমুঠো জোটে। কারণ দাতুর কয়েকটি কোম্পানীর কিছু শেয়ার আছে। তার ডিভিডেণ্ড মন্দ হয় না। কিন্তু টাকা চেয়ে নেবার কথা মনে হয়নি। তাহলে অচ্যুতদেব দোকানের স্পেশাল মনোহরা কিনে নিয়ে আসতে পারত। কী করবে ভেবে পায় না আকাশ।

অচ্যুত বলে—কি হলো ?

পয়সা নেই তো।

আরে মরমীদি আমারও বোন। তাছাড়া জানিস তো আমাদের বংশ তোদের এত খেয়েছে যে রোজ মিষ্টি কিনে দিলেও তার কিছুই শোধ হবে না।

তুই আমার অহমিকাটা উস্কে দিচ্ছিস অচ্যুত।

হো হো করে হেসে অচ্যুত পাশের একটা মিষ্টির দোকান থেকে দশ টাকার সন্দেশ কিনে বলে—খেতে কেমন হবে জানি না। তবে ছানা এক নম্বর।

ওরা খুঁজতে খুঁজতে শেষে সেই বিখ্যাত গঙ্গোপাধ্যায় বংশের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। অনেক অলিগলির মারপ্যাঁচ কাটিয়ে গঙ্গার প্রায় কিনারায় একটা ভাঙা বাড়ি। এককালে কি ছিল বলা যাবে না। তবে এখন নরেন গাঙ্গুলীর বসতবাটি বলতে ইঁট-খসা তুখানা ঘর। সেই ঘরের ছাদ হয়ত ফেটে গিয়েছে কিংবা ধসে গিয়েছে। ফলে ওপরে টিনের চালা। এই রকম ভাঙাচোরা, তারই মধ্যে আবার তুএকটা চুনকাম করা ছোটখাটো বেশ কয়েকখানা ঘর ইতস্তত একটা ফাঁকা জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে জমি এককালে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল বলে বোঝা যায়। এই সবটা নিয়ে এককালে ছিল হয়ত মরমীর মামার আবিষ্কৃত

বিখ্যাত গঙ্গোপাধ্যায় বংশের ভদ্রাসন।

ওর বংশেরই কেউ সম্ভবত আকাশদের নরেন গাঙ্গুলীর বাড়িটা অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখিয়ে দিয়ে কাঁধে গামছা ফেলে গঙ্গার ঘাটের দিকে ছুটল। পাশে পতিতোদ্ধারিণী বয়ে চলেছেন। তাই দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার দেহমনের পাপ মোচন করে আসার অভ্যাস হয়ত এদের।

আকাশরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। এগিয়ে যায় ঘরখানার দিকে। আকাশের ধারণা হয়েছিল, মরমীর বোধহয় কোনো স্বাধীনতাই নেই। কিন্তু তার দারিদ্র যত প্রচণ্ডই হোক বাড়িটা দেখে স্বাধীনতার অভাব আছে বলে মনে হলো না।

কড়া নাড়ার আগেই তাড়াতাড়ি হাট হয়ে খুলে যায় দরজাটা আর একজন কঙ্কালসার শ্যামবর্ণের বউ বিস্ফারিত নেত্রে তাদের দিকে চেয়ে থাকে।

অচ্যুত বলে—নরেনবাবু আছেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে বধূটি বলে—না।

তাঁর স্ত্রী?

ততক্ষণে আকাশ তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে এসে ভালভাবে দেখে নিয়ে বলে—অচ্যুতের দোষ নেই। আমিও তোকে চিনতে পারিনি। শুধু তোর ভ্রূ আর ঠোঁটের নিচের বড় তিলটা চিনিয়ে দিল।

মরমী ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়েও ময়লা আঁচল দিয়ে মুখটা চেপে ধরে। সে ওদের ঘরের ভেতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করে। ওরা ভেতরে গেলে মরমী পাশের ঘরখানায় চলে যায়। সামলে নিতে সময় দেয় আকাশরা।

ঘরের মধ্যে একটা উঁচু বার্নিশ ওঠা মান্ধাতা আমলের খাট আর বড় বড় কয়েকটা ঠাকুর দেবতার ফটো ছাড়া ঐশ্বর্য বলতে কিছু নেই। আসলে দারিদ্র্য এখানে চাপা অবস্থায় না থেকে উৎকট ভাবে কাঁদছে যেন। এ-দশা অতি গরীবের বাড়িতেও সচরাচর চোখে পড়ে না।

বিশেষত মরমীর মতো মেয়ের ঘরে এ-দশা কল্পনা করেনি আকাশ। সে ভেবেছিল, অচ্যুত এসব দেখে হয়ত কথা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তার দিকে চেয়েই ভুল ভাঙল। দেখল অচ্যুত মিটিমিটি হাসছে। একটু ঘা খেল আকাশ। তবে মরমীর জন্যে অচ্যুতের দুঃখবোধ হবেই বা কেন? মরমী তো তার কেউ নয়। তবু মানুষ হিসাবেও কি তার এই হাসি বেমানান নয়?

হাসছিস কেন তুই? ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে আকাশবিজয়।

তোর অবস্থা দেখে?

আমার অবস্থা?

হ্যাঁ। মানে হচ্ছে যেন তুই তোর বোনকে রাজরানীর মতো দেখবি বলে আশা করে এসে চোট খেয়েছিস। অত অবাস্তব কেন রে তুই? আমি তো দেখে খুশি। তোর মুখে শুনে ভেবেছিলাম মরমীদি বুঝি বন্দিনী। তার সারা গায়ে দেখব নরেনবাবুর অত্যাচারের চিহ্ন। ভেবেছিলাম তোর বোন কাশবে আর গলা দিয়ে দলা দলা রক্ত বার হবে। সে সব কিছুই দেখলাম না। এ তো বরং ভালই। তাই তোর দশা দেখে না হেসে পারলাম না। তোরা একরকমের চিন্তা করিস আর প্রতিক্রিয়া আর এক রকমের।

আকাশ ভাবে, সত্যিই তো। মরমীকে আরও খারাপ দেখবে ভেবেই তো এসেছিল।

সেই সময় মরমী ঘরে ঢোকে। চোখ দুটো লাল হলেও বেশ সামলে নিয়েছে।

আকাশবিজয় প্রশ্ন করে—কত্তাটি কোথায়?

নেই। তাই বসতে পেরেছিস। থাকলে বসতে দিত না। সব সময় তো মদে চুর হয়ে থাকে ছুটির দিনে। তাছাড়া অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি। এখনো সবগুলোর মানে জানি না।

তোকে মারে?

মরমী কথাটা শুনেই হঠাৎ কীরকম কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাবার মতো হয়। আকাশ তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে খাটের ওপর

বসিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করে—এরকম হলো কেন?

কাঁপা গলায় মরমী বলে—মাঝে মাঝে হয়। হঠাৎ ভয় পেয়ে যাই। আমার গায়ে দাগ নেই, তবু মারে। সে যে কী ভীষণ! তাছাড়া—তাছাড়া—নাঃ, তোকে তো বলতে পারব না।

মরমী ঘেমে ওঠে। ওর চোখমুখের চেহারা অস্বাভাবিক দেখায়। ও আবার হাঁপাতে থাকে। আকাশ ওর শির-ওঠা দুটো হাত দুহাতে চেপে ধরে। তারপর মরমী একটু স্বাভাবিক হলে ছেড়ে দেয়।

আমি বোধহয় বাঁচব না রে। কিংবা পাগল হয়ে যাব।

আকাশবিজয়ও সেই কথাই ভাবছিল। আগের মরমীকে আর কোনোদিনও পাওয়া যাবে না। ছেলেবেলায় ওকে দেখলে আকাশবিজয়ের বাড়ির সেই গাছ থেকে টুপ্‌টাপ্‌ করে ঝরে পড়া শিউলি ফুলের কথা মনে হতো। কোথায় যেন মিল ছিল একটা। আজ সেই শিউলি নরেন নামে দৈত্যটার পদতলে দলিত নিষ্পেষিত। একটা শিউলি কি কখনো দুবার সজীব হয়ে ওঠে? আগের মরমী এ-জন্মের মতো হারিয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারলে ক্ষণিকের নিষ্কৃতি পেত আকাশবিজয়।

অচ্যুত মিষ্টির প্যাকেটটি তাড়াতাড়ি খুলে বলে—আসুন মরমীদি মিষ্টি খাই।

মিষ্টি? কে খাবে?

কেন? আমরা তিনজনে?

আমার খেতে ভাল লাগে না।

লাগবে। আসুন না।

আর ও?

কে? নরেনবাবু? রেখে দেব দুটো।

না না। বিশ্বাস করবে না। ভীষণ রেগে যাবে। দরকার নেই মিষ্টির। থাক।

কিন্তু আমরা এনেছি যে।

কেন আনতে গেলে ভাই ?

আকাশবিজয় প্যাকেট খুলে আদেশের সুরে বলে—অত বকবক করিস না। খেয়ে নে কটা। অচ্যুত, তোর কাছে টাকা আছে ?

আছে ?

ঠিক আছে। তেমন বুঝলে নরেনবাবুর জন্যে আর এক প্যাকেট এনে দেব। তুই খা। আয়।

ভীষণ রেগে যাবে।

রাগুক। আমরা থোড়াই কেয়ার করি।

মরমী কিরকম বোকার মতো হেসে বলে—তোর কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে।

এরপর সত্যিই মরমী সন্দেশ খায় এবং একটা নয়। প্রায় সব কটাই। বুভুক্ষু অবস্থায় এভাবে দিনের পর দিন থাকে নিশ্চয়।

হঠাৎ হুঁশ হয় মরমীর। বলে—ওমা, আমিই যে সব খেয়ে ফেললাম।

ধ্যুৎ, তুই আর কটা খেয়েছিস ? সবচেয়ে বেশি খেয়েছে ওই অচ্যুত। নিজেদের মিষ্টির দোকান, তবু আশ মেটে না। ক'টা খেলি রে অচ্যুত।

আমার খুব ভাল লাগে। নিয়ে আসব আরও ?

যা তো।

না না। অত পয়সা—

অচ্যুত বার হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মরমী আকাশে কোলের ওপর ভেঙে পড়ে ফুঁপিয়ে ওঠে—আমাকে নিয়ে যা। আমি বাবার কাছে যাবে। আমি বাবার কাছে যাব।

সেই সময় বাইরে পদশব্দ। একটু পরেই নরেনের প্রবেশ। মরমী ছিটকে দূরে সরে যায়।

নরেনের চোখ টকটকে। চেঁচিয়ে ওঠে—কে হে তুমি ? আমার ওয়াইফের—

আহঃ, আস্তে নরেনবাবু আপনার পর নই আমি।

চুপ কর হারামজাদা। দিনদুপুরে পরের বউকে ফুসলোতে এসেছিস। আবার বড় বড় বুলি। তুই সেই খুনেটা নয়? বিয়ের রাতে আমাকে খতম করতে এসেছিলি।

আকাশের মাথায় আগুন জ্বলে। কিন্তু সে ধৈর্য হারায় না। মরমীকে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যেতে দেখেও সে চুপ করে বসে থাকে। নরেন কিছুক্ষণ দাপিয়ে বেড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা লাঠি খুঁজে আনে।

আকাশ শান্ত কণ্ঠে বলে—স্থির হোন নরেনবাবু। আমি আপনার শ্যালক।

নরেন লাঠি ঠুকে বলে—ফাঁদে পড়লে অমন কত শুয়োরের বাচ্চা শ্যালক বনে যায়। আমার সাক্ষাৎ শ্যালক কেউ নেই।

আকাশের মাথার মধ্যে ঝড়। কিন্তু তাকে বিচলিত হলে চলবে না। মরমীর মঙ্গলই তার কাম্য। সে বলে—আছে, জানবেন কেমন করে। বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে তো আর গেলেন না।

না গেলেও জানা যায়। আমার ওয়াইফের আপন মায়ের পেটের কোনো ভাই নেই।

অত অস্থির হবেন না। মায়ের পেটের ভাই না হলেও আমি তার ভাই। রক্তের সম্পর্ক রয়েছে আমাদের।

অত জ্ঞান দিস না। মায়ের পেটের ভাই না হলেই সে পরপুরুষ।

সেই সময় অচ্যুত এক প্যাকেট মিষ্টি হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে। তারপর চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নরেনকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বলে—মরমীদির কি হলো রে আকাশ?

নরেন একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়।

অচ্যুত তাড়াতাড়ি মিষ্টির প্যাকেট আকাশের হাতে দিয়ে নরেনকে একটু ঠেলে পথ করে নিয়ে মরমীর পাশে বসে পড়ে। তারপর তাকে ধীরে ধীরে তুলে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। নরেন একটুও নড়তে পর্যন্ত পারে না।

আকাশকে অচ্যুত বলে—এই মাতালটা এঘরে ঢুকল কি করে।

হাতে লাঠি দেখে ভয় পেয়ে গেলি ? মরমীদি একে দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়েছেন। নরেনবাবু কখন আসবেন ? তাঁর জন্য মিষ্টি কিনে আনতে বলল মরমীদি। এর মধ্যেই মঞ্চে বেয়াদপ মাতালের প্রবেশ। দাঁড়া, ওর লাঠি ওরই পিঠে ভাঙছি। আমাকে তো চেনে না।

আকাশ অচ্যুতের কথাবার্তা শুনে নরেনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা করে। কিন্তু নরেন অচ্যুতের কথাবার্তা শুনে এবং দলে এরা ভারী বলে কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছে। আকাশ বলে—নরেনবাবুকে কেউ বোধহয় জোর করে মদ গিলিয়ে দিয়েছে। মদের ঝোঁকে আমাকেও যাচ্ছেতাই বলছিলেন,—ইনিই নরেনবাবু—

আরে তাই নাকি ? ছি ছি। আপনি আমাদের জামাইবাবু, সেকথা বলবেন তো। কে আপনাকে মাতাল করেছে বলুন তো ? আমার হাতে গণ্ডায় গণ্ডায় গুণ্ডা আছে। লেলিয়ে দেব।

না, মানে।

না না, অত ভয় পাবেন না। এ-পাড়াতেও আমার লোক রয়েছে। এখুনি চলুন। আপনি শুধু ইশারায় বলে দেবেন। কাল দেখবেন তার ডেড বডি পড়ে রয়েছে।

আকাশ বলে—আহা, তেতে পুড়ে এলো লোকটা। এখুনি নিয়ে যাবি কি ? বরং ওঁর মিষ্টিটা দে—

না, এখন দেব না। নেশা বেড়ে যাবে ? পরে হবে 'খন। অচ্যুত আকাশের হাত থেকে মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে দেয়ালের একটা তাকের ওপর রেখে দেয়। আকাশ ভাবে অচ্যুতটা দারুণ তো।

মরমী ততক্ষণে উঠে বসে। তার চোখে ভীত চাহনি। বারবার সে নরেনের মুখের দিকে চায়। ভাবে, এর জন্যে হয়ত আজ রাতে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে। সেই জঘন্য শাস্তি দেবার প্রথা, যাতে গায়ে দাগ পড়ে না—অথচ—

অচ্যুত নরেনের হাত ধরে বসিয়ে, একটা উনোন ধরাবার পাখা ঘরের কোণ থেকে টেনে নিয়ে এসে তাকে বাতাস করতে থাকে।

নরেন এমন ভাব করতে থাকে যেন সত্যিই কেউ তাকে জোর করে মদ গলায় ঢেলে দিয়েছে। অচ্যুত আকাশের দিকে চেয়ে চোখ টেপে।

কিছুক্ষণ পরে অচ্যুত হাত-পাখা রেখে দিয়ে নরেনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—এখন কেমন বোধ করছেন জামাইবাবু? একটু ভাল তো?

পাঁড় মাতাল নরেন আজ এমন বেশি কিছু নেশা করেনি। চুর হয়ে থাকলেও তার কিছু হয় না। তাই বলে—খারাপ নয়। মাথাটা একটু পরিষ্কার হয়েছে।

অচ্যুত সঙ্গে সঙ্গে উঠে মিষ্টির প্যাকেটটা নরেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে মরমীকে বলে—একটু জল এনে দিন মরমীদি।

অচ্যুতের এইসব অভিনয় ভাল লাগছিল না আকাশবিজয়ের। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছিল মরমীকে। সাধারণত তার চোখ দিয়ে জল পড়ে না। তবু যেন কাঁদতে পারলে একটু ভাল হতো। মরমীর শরীর আর মন তো বিধ্বস্ত হয়েইছে, রঙটাও একেবারে পুড়ে গিয়েছে। সেই শাঁখের মতো রঙ সে আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। শরীরের সেই কোমল ভাবও একেবারে অদৃশ্য। দড়ির মতো পাকিয়ে গিয়েছে সারা দেহ।

ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতেই আকাশ অবাক হয়ে দেখে অচ্যুত নরেনের সঙ্গে একটু একটু আলাপ জমাতে শুরু করেছে। জুটমিলের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা থেকে পাটের বাজার, সরকারের বিমাতৃ-সুলভ আচরণ ইত্যাদি বহু জ্ঞানের বিষয় নিয়ে দুজনার মধ্যে আলোচনা চলছে। নরেন জুটমিলে কাজ করে বলে অচ্যুত সব জেনে শুনে এসেছে নাকি? নইলে পাটের বাজারদর বলে দিল কি করে ফট করে?

শেষ পর্যন্ত নরেনকে শ্বশুরবাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে অচ্যুত। হতভাগা বুঝল না সেখানে দুবেলা ভাত জোটানো মুশকিল হবে। তবে নরেন বিনয়ের সঙ্গে বলল, মিলের এই অবস্থায় কোথাও

নিশ্চিন্তে যাওয়া সম্ভব নয়। তবু কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো অচ্যুতের আমন্ত্রণ সে নীতিগত ভাবে গ্রহণ করে।

এরপরই অচ্যুত হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসে। পকেট থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে নরেনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে—কদিন একা একা একটু রেঁধেবেড়ে খাবেন। আমরা মরমীদিকে দুদিনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

নরেন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। তার মুখ দিয়ে 'এ্যাঁ এ্যাঁ' শব্দ বার হয়। অথচ হাতের নোট সে ফেলে দিতে পারে না।

সেই অবকাশে অচ্যুত বলে—মরমীদি, তাড়াতাড়ি একটা ভাল শাড়ি পরে আসুন তো।

ভাল শাড়ি?

ভাল, মানে পরিষ্কার শাড়ি।

এবং কিছুক্ষণ পরে মরমীকে নিয়েই ওরা বার হয়ে এল গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা থেকে। নরেন হাঁ করে দরজার চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে রইল। হাতে তার দশ টাকার নোট। ভাবে, সন্ধ্যায় নেশাটা জোর জমবে। তারপর হারামজাদী ফিরে এলে উসুল করা যাবে।

বাসে চেপে বসার আগে আকাশ মরমীকে প্রশ্ন করে—তোর একটা ননদ ছিল না?

হ্যাঁ, বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

ভালই হয়েছে।

হ্যাঁ, ভাল না ছাই। বাপের বয়সী বর। এ শুধু মদ খায়, তার আরও অনেক গুণ আছে।

আকাশ ভাবে মরমীর কথাবার্তা কেমন যেন সাধরণ হয়ে গিয়েছে। আগে অত অভাব ছিল, তবু কথার ধরনে, বলবার ভঙ্গিতে কী যে একটা ছিল, আজ যা নেই। তবে সে বুঝতে পারে মরমীর মন বিধ্বস্ত হয়ে যাবার কারণ হয়ত চিরকাল অকথিতই থেকে যাবে।

বাড়িতে মরমীকে নিয়ে এসে সবার 'আহা উহু' কাটিয়ে কয়েক লিটার অকৃত্রিম অশ্রুজল ঝরে পড়ার পরে যখন অমরবিজয়ের কাছে উপস্থিত করা হলো, তখন মেয়ের দিকে অমরবিজয় ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

মরমী কেঁদে উঠে বলে—বাবা, আমাকে চিনতে পারছ না?

কে তুমি?

আমি—আমি মরমী।

ক্ষেপে গিয়ে অমরবিজয় বলে ওঠে—ঠাট্টা করা হচ্ছে। তাই না? একে নিয়ে যাও তোমরা। আমাকে আমার সেই মরমীকে এনে দাও।

মরমী ডুকরে কেঁদে বলে—বাবা, আমিই সেই মরমী। এই অবস্থা হয়েছে আমার। তোমার কাছে থাকতে দাও, আগের মরমী হয়ে যাব।

আবার ঠাট্টা হচ্ছে?

না বাবা, ঠাট্টা নয়। আমার গলাও কি চিনতে পারলে না?

কিছুক্ষণ ভেবে অমরবিজয় বলে—ঠিক বলছিস?

হ্যাঁ বাবা। বাবাকে কেউ মিথ্যে বলে?

খানিক আপন মনে বিড়বিড় করে শেষে অমরবিজয় বলে—থাক তবে।

,

সত্যবিজয় মাঝে মাঝে আসে। অনন্তবিজয়ের সঙ্গে দেখা করে যায়। আকাশ 'কুহকিনী' ফ্ল্যাটে পদার্পণ করতে চায় না বলে, সত্যবিজয়কে আসতে দেখলে বাড়ি থেকে বার হয়ে যায়। মায়ের কাছে আকাশ শুনেছে অনন্তবিজয় কড়া কথা অবধি বলেছে সত্যবিজয়কে একদিন। সত্যবিজয় তাতে শুধু হেসেছে। মায়ের অভিমত হলো মুখোপাধ্যায় বংশের আত্মসম্ভ্রম বোধের কিছুই অবশিষ্ট নেই লোকটার মধ্যে। চামড়ার ব্যবসা করতে করতে একেবারে চামার হয়ে গিয়েছে। গায়েও গণ্ডারের চামড়া। আকাশ

ভালভাবেই জানে আত্মসম্মান বোধ বৃত্তিগুলোকে এ-যুগে চারিত্রিক দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করা হয়; যা ভাঙিয়ে বাস্তববাদী মানুষেরা পয়সা করে। ওসব হলো সেই যুগের জিনিস, যখন আদর্শবাদের বুলি ঝেড়ে মুষ্টিমেয় একদল মানুষ সবাইকে ঠকিয়ে অবাধে লুটপাট চালাত। সাধারণ মানুষ এখন আগের মতো অতটা বোকা আর নেই। বোকা থেকে গিয়েছে কিছু পেছিয়ে পড়া মানুষ, যারা এখনো বড় বড় কথা আর ধ্যান-ধারণাকে সত্য বলে ভাবে। সত্যবিজয় অনন্তবিজয়ের মতো বোকা নয়। সস্তা অপমানে তার গায়ে ফোস্কা পড়া দূরে থাকুক, আঁচড়ও লাগে না।

একদিন আকাশ সত্যবিজয়ের একেবারে সামনে পড়ে যায়। সাদা গাড়িখানার তত্ত্বাবধান এত ভাল যে কোনো আওয়াজই হয় না থামার সময়। কখন বাড়ির সামনে এসে থেমেছে টের পায়নি।

আকাশকে দেখে হেসে সত্যবিজয় বলে—তোমার জন্যে আমরা সবাই কিন্তু অপেক্ষা করে আছি এখনো।

কি সুন্দর কথা। কোনো দাহ নেই এই কথার মধ্যে। অনন্তবিজয় হলে, এতবার বলা সত্ত্বেও কেউ বাড়িতে না এলে যাচ্ছেতাই অপমান করে দিত। বয়োজ্যেষ্ঠকে অপমান করার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠত। কিন্তু সত্যবিজয়ের কথায় কোনোরকম খোঁচা নেই। আকাশকে সে যত নিচুই ভাবুক, কথা বলে যেন সমানে সমানে।

আকাশ জানে, সে যদি দিগ্বিজয় হতো, তাহলে ধনীদের এই নরম কথায় জ্বলে উঠত। কিন্তু সে আকাশ। বংশের কয়েক পুরুষের সব দুর্বলতা নিয়ে সে জন্মেছে। তাই একটু আমতা আমতা করতে গিয়েও বলে ফেলল—একটা সঙ্কোচ আছে তো। কাটিয়ে উঠতে পারি না।

কেন, সঙ্কোচ কিসের ?

কীভাবে থাকি দেখছেন তো। ওসব'বাড়িতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হলেও হতে পারি।

ভুল। গিয়ে দেখো ভুল ভাঙবে। দূরে থাকি ঠিকই।

তোমাদের ভালমন্দে আমাদের কিছু এসে যায় না। তবু বংশটার ওপর টান আছে একটা। এইটকুই আমার কুসংস্কার। সেই কুসংস্কারের দুর্বলতার জন্যে তুমি আমাদের বাড়িতে আদরই পাবে। তোমার পোশাক কিংবা অন্য কিছু সবার দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে।

আকাশবিজয়ের মনটা মুহূর্তের মধ্যে স্বচ্ছ হয়ে যায়। সে বলে ফেলে—আমি শীগগিরই এক ছুটির দিনে যাব।

গুড।

আকাশ বুঝল, সে ভুল করে ফেলল। দিগ্বিজয় হলে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখান করত। তার কাছে রক্তের সম্পর্ক বলে কিছু ছিল না। একদল শোষণকারী, অপর দল শোষিত।

তবু ধীরে ধীরে বলে—ঠিকানাটা দরকার হবে।

ও ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি তো উত্তর কলকাতার ছেলে, ওদিকের সবাই মোটামুটি কুহকিনী এ্যাপার্টমেণ্ট চেনে। এটা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ড্রিমি পার্কে। মোটর ভেহিকেলের আগের স্টপে নেমে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে।

সেই সময় মরমী আসছিল এদিকে। হাতে কিছু আনাজের খোসা। সত্যবিজয়কে দেখে পেছন ফিরে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

তোমাদের কাজের মেয়েটি পালালো কেন?

'ঝন্' করে একটা শব্দ হয় 'আকাশের মাথার ভেতরে। সে সামলে নেয়। তার ফর্সা মুখ এই সব পরিস্থিতিতে রক্তিম হয়ে ওঠে।

তবু সে স্পষ্টভাবেই বলে—কাজের মেয়ে নয়। মুখুজ্জে বংশেরই মেয়ে।

সরি।

সত্যবিজয় আর একবার অনন্তবিজয়ের মন জয়ের চেষ্টায় ভেতরে চলে যায়। আকাশের আর ইচ্ছে হয় না, মরমীর লুপ্ত রূপের কথা তাকে ব্যাখ্যা করে বলতে। কুহকিনী এ্যাপার্টমেণ্টের বাসিন্দা হলে মরমী হয়ত শ্রেষ্ঠ রূপসীর পর্যায়ে পড়ত।

একমাস হয়ে গেল মরমী এসেছে। আকাশ ভেবেছিল, দুদিন পরেই ভগ্নিপতি-পুঙ্গব এসে তাকে নিয়ে যাবে। কিছু গালমন্দও করবে। কিন্তু এলো না। মরমীও নীরব। রেখে আসতে বলে না। একদিন কথাটা উত্থাপন করায় মরমী কিংবা, তার মায়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অথচ দায়িত্বটা তারই। এর ফলে মরমীর ওপর যদি বাড়তি অত্যাচার হয়, তাহলে দায়ী হবে সে। তাই সত্যবিজয় ভেতরে চলে গেলে আকাশ মরমীরদের ঘরে যায়।

সেই চামড়ার ব্যবসায়ী। তাই নয়?

হ্যাঁ।

ঠিক ধরেছি।

অমন করে পালালি কেন?

লজ্জায়!

গেলেই পারতিস। তাহলে আমাকে আর তোর পরিচয় দিতে হতো না।

জিজ্ঞাসা করল বুঝি?

হ্যাঁ।

বেশি-বেশি।

তুই কবে শ্বশুর বাড়ি যাবি?

যেদিন নিতে আসবে।

যদি না আসে?

জানি না।

এটা ভাল হচ্ছে না মরমী। এতে তোর বিপদ বাড়বে।

মরমী কেঁদে ফেলে।

জীবনে প্রথম আকাশ একটা গুরুভার অনুভব করে। অচ্যুত মরমীর জন্যে যে টাকা খরচ করেছিল সেটা এখনো শোধ হয়নি। তার জন্যে আকাশ কদিন হলো একটা টিউশানি যোগাড় করেছে।

এ অবস্থায় চপলাসুন্দরী কি বলত বলে মনে হয় মরমী?

জানি না।

কেঁদে লাভ নেই।

তুই বুঝবি না। লোকটা বিকৃত। তোকে বলতে পারব না। মাকে কিছুটা বলেছি। আমি পাগল হয়ে যাব।

কী বলছিস ?

মরমী চুপ করে যায়।

এরপর আর তাকে কিছু বলা যায়নি। সে রয়ে গেল।

আকাশ মনে মনে ঠিক করেছে, বাড়িতে বসে মরমী যাতে কিছু উপার্জন করতে পারে সেরকম কোনো পথ বার করতে হবে।

শুধু সত্যবিজয় নয়, অনেক অবাঙালিও ঘোরাফেরা করছে মুখুজ্জেদের বাস্তুভিটা কিনে নেবার জন্য। এত বড় জমির ওপর এই জীর্ণ বাড়িখানা দেখলেই পয়সাওলা মানুষদের দাঁও মারার ইচ্ছা জাগে। বুঝতে পারে সস্তায় কিস্তিমাতের জায়গা এটি, এইসব হীনবল বাড়ির মলিকদের লোভ দেখানো খুব সহজ। এরা বর্তমান জমির দর জানে না। এদের সহজে ভয়ও দেখানো যায়। আর এক ধরনের মানুষ আছে তারা আরও মারাত্মক। তাদের টাকার রঙ কালো। সেই টাকা খুব বেশী করে খরচা করতে চায় বিনা কারণে। তবে দুই দলই এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শহরবাসীও যেন চায় না নতুন নতুন দালান কোঠার মধ্যিখানে এই সাক্ষাৎ বেমানান কুশ্রী দারিদ্র্যের ছাপ পীড়াদায়ক হয়ে থাক। থাকুক না কেন তার লোহার রেলিং-এ সেকালের অত্যন্ত দামী কারুকার্যের রূপরেখা।

অনন্তবিজয় অস্থির হয়ে ওঠে, নানান মানুষের আনাগোনার হিড়িকে। এককালের এই প্রসিদ্ধ বংশের যৌথ পরিবারের ছোঁয়া এখনো কেন যেন লেগে রয়েছে এ-বাড়িতে। কেউ এলে বাড়ির সবাই আঙুল তুলে বিনা দ্বিধায় দেখিয়ে দেয় অনন্তবিজয়ের ঘর। পৃথ্বীবিজয়, প্রশান্তবিজয় কিংবা বাড়ির বউ এরা সবাই মনে মনে নিশ্চিত যে সবার ওপরে রয়েছে অনন্তবিজয়। সে যা করবে তাই

হবে। কেউ নিজের মতামত জোর করে চাপানোর চেষ্টা করবে না। সোরা আর কিছু কিছু পারদের মতো, রক্তের মধ্যে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে যৌথ পরিবারের নিশ্চিন্ততা। হয়ত আলস্য, অক্ষমতা আর অজ্ঞতাই এর কারণ। তবু একে অস্বীকার করা যায় না। অথচ সবারই তীব্র অর্থাভাব! তবু এ-বাড়িতে সব কিছু বলার মানুষ একজনই আর সেই মানুষটি অতীতের সমস্ত গর্ব সংস্কার ইত্যাদি নিয়ে জমজমাট হয়ে বসে রয়েছে। এ-বাড়ি সে কিছুতেই হাতছাড়া করবে না।

সন্ধ্যার পর আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকলেও, অন্য সময় অনন্তবিজয়ের মস্তিক খুব পরিষ্কার। সেই সময় সে পুরোনো দিনের পত্রপত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করে। খাটের ওপর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে মাঝে মাঝে ঢুলতে থাকে। বাকি সময় সে যেন চিড়িয়াখানার বাঘ। ঘরময় পায়চারি করে শুধু। পায়ে হেঁটে কলকাতার রাস্তায় খুব বেশী ঘুরে বেড়ায়নি সে। অতি ছেলেবেলায় বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চেপে হামেশাই যাতায়াত করেছে। বাবার একটা ফিটন ছিল। সেই গাড়িটা অনেকদিন অবধি চলেছে। ঘোড়া মরেছে গোটা দুয়েক। আবার কিনে আনতে হয়েছে। কিন্তু সে সব অনেক পুরোনো দিনের কথা। ফিটন উঠে গেলে মোটর গাড়ি কেনার আর সাধ্য ছিল না এ বংশের। তখন থেকে অনন্তবিজয় খুব কমই বাইরে বার হয়েছে। মাঝে মধ্যে ভাড়া করা গাড়িতে চেপেছে, পায়েও হেঁটেছে। কিন্তু যতবার বাড়ির বাইরে বার হয়েছে, তার মনে হয়েছে রাজ্যসুদ্ধ লোক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে তারই দিকে। কখনো যেন দেখতে পেয়েছে পাড়ার মানুষদের মুখে বিদ্রুপের হাসি—মুখুজ্জেদের বংশধরের এই পরিণতি? ফর্সা মুখ আপনা থেকেই লাল হয়ে উঠেছে অনন্তবিজয়ের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আরও দূরে চলে গিয়েছে। শেষে রাতের অন্ধকারে চোরের মতো ফিরে আসত। এরপর বাইরে বার হতে হলে অন্ধকার হলে তবে বার হতো। তবু বাড়ির একজনকে গিয়ে

দেখে আসতে হতো বাড়ির বাইরে পরিচিত লোকজন আছে কিনা। অল্প দূরে একটা পান-বিড়ির দোকান ছিল। লোকটা পেটের গেঞ্জি তুলে ভুঁড়ি বার করে সব সময় রাস্তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। অনন্তবিজয়ের যত রাগ তার ওপর। ক্ষমতা থাকলে দোকানটা উঠিয়ে দিত।

এখন অবশ্য পথে বার হবার বালাই চুকে গিয়েছে। তবু সে বাড়ির প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কর্তা। কারণ তার মতো আর কেউ পায়ে হেঁটে রাস্তায় বার হতে সঙ্কুচিত হয় না তার মতো মন্ত্র জপ করে নিজে গ্রন্থি দিয়ে পৈতে পরতে পারে না কেউ। তার মতো কপালের মাঝখানে লাল টকটকে জন্মগত রাজতিলক নেই কারও।

বড় যে ঘরটায় এখনো টানাপাখার ফ্রেমের কাঠ ঝুলছে, এককালে সেখানে পরপর কয়েকটা অয়েলপেন্টিং ছিল এই বংশের পূর্বপুরুষদের। সেগুলো কীভাবে স্থানচ্যুত হয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু মাত্র অনন্তবিজয়ের পিতামহ ইন্দ্রবিজয়ের ধূলায় মলিন এবং অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া একটা পেন্টিং দেয়ালে না ঝুলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে হেলান দেওয়া রয়েছে। আকাশবিজয় বুঝতে পারে পেন্টিংটা খুব দামী! চারপাশের সোনালী রঙের মোটা ফ্রেমের দাম-ই হবে কত। ছবির এক কোণে কোনো এক সাহেব আর্টিস্ট-এর নাম লেখা। এক এক সময় ছবিটির প্রতি তার অনুকম্পা জাগে। এই ভদ্রলোক ছিলেন বলেই না তার অস্তিত্ব। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিজয়ের কথা মনে পড়ে যায়। সে বলত, এইসব চরিত্রের ভদ্রলোকদের জন্য সারা পৃথিবীতে বঞ্চিতের এত সংখ্যাধিক্য। ছুরি হাতে নিয়ে দিগ্বিজয় বলত—কতবার মনে হয়েছে এটাকে ফাঁসিয়ে দিই। তারপর ভাবি এসব মৃত ব্যক্তিদের ওপর বীরত্ব ফলিয়ে লাভ নেই। জ্যান্ত ইন্দ্রবিজয়দের মোকাবিলা করাই ভাল।

আকাশ তখনো দিগ্বিজয়ের আসল পরিচয় পায়নি। ভাবত, এসব হলো কথার কথা। ভাবত, দিগ্বিজয়ের কথা বলার সময়ের উত্তেজনা, কপট উত্তেজনা। সে সব কথা যে কত সত্য সেটুকু অনুভব

করার মতো মস্তিক তার ছিল না।

বলত, বুঝলি আকাশ, আমাদের ধমনীতে যেমন, রক্তেও তেমনি শক্তিমানদের সঙ্গে আপোস করার মজ্জাগত বীজাণু। অথচ অসহায় দরিদ্রকে দেখলেই তার ওপর হম্বিতম্বি। সে বেচারা বাড়ির কাজের লোকই হোক আর যে-ই হোক।

দিগ্বিজয়কে কী যে ভাল লাগত আকাশের। তার রক্তাপ্লুত দেহখানাকে দেখে আকাশের মনে হয়েছিল, সপ্তরথীর অন্যায় ব্যূহের ভেতর থেকে অভিমন্যুকে বার করে নিয়ে আসা হয়েছে যেন। বাড়ির মেয়েরা কেঁদেছিল। অমরবিজয় শুধু একবার বেখাপ্পা ভাবে হেসে উঠেই বোকার মতো থেমে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্কের অসুস্থতার সূচনা তখন থেকেই। তার যত টান ছিল দিগ্বিজয়ের ওপর। তারপর মরমীর প্রতি। বলত, দিগ্বিজয় তার মানসসন্তান। সে নিজে যা স্বপ্ন দেখত অথচ বাস্তবে যা করা তার সাধ্যাতীত, দিগ্বিজয় ছিল তাই। দিগ্বিজয়ের বাবা পৃথ্বীবিজয় গম্ভীর হয়ে এগিয়ে এসে পুত্রের দেহে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়ে সহসা উঠে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে পৃথ্বীবিজয়। শুধু তার মেয়ে কল্যাণীকে দেখে বোঝা যায় পৃথ্বীবিজয় বাড়িতে আছে কি নেই। কল্যাণীর মা নেই। মাঝেমাঝে তার পিসি আসে ভাই-এর দেখাশোনা করতে। তখন সঙ্গে আসে তার ছেলে ঘোটন। একবার এলে অনেকদিন থেকে যায়। ঘোটনকে দেখে মনে হয় না সে পড়াশোনা করে বলে।

আকাশবিজয় জানে, জীবনে শতসহস্র তপস্যা করলেও দিগ্বিজয়ের শতাংশের একাংশও সে হতে পারবে না। ছেলেবেলায় যেমন এখনো তেমনি একটা নিরেট আত্মগ্লানি নিয়ে তাকে জীবন কাটাতে হবে। আশেপাশের সবাইকে সে দেখে, তারা মানসিক দিক দিয়ে অনেক মুক্ত। তার মতো কেউই দেড়শো দুশো বছরের গুরুভার বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে না। অনন্ত-বিজয়ের পর তার পুত্র সমরবিজয়কে ডিঙিয়ে মুখুজ্জে বংশের

রক্তমাহাত্ম্য তার ধমনীতে কিছুটা ফিকে ভাবে হলেও ভাল রকম জেঁকে বসেছে। এর থেকে বোধহয় পরিত্রাণ নেই। অনেক অত্যাচার অনাচার আর স্নায়ু-উত্তেজক অনেক কিছু যা এককালের দেয়ালে টাঙানো অয়েলপেন্টিং-এর মানুষগুলো এবং ওই সিঁড়ির পাশে হেলান দেওয়া মলিন হয়ে যাওয়া মানুষটি করেছিল। ফলে অতি চাঞ্চল্যের পর যা হয় তাই হয়েছে। রক্ত আজ নিস্তেজ, নিরুত্তাপ? মোটামুটি বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কর্মতৎপরতা থাকে তা আর নেই। সত্যবিজয় এবং অনেকে এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তারা হয়ত তাদের মাতৃকুল থেকে এইসব বৈপরীত্য লাভ করেছিল। মাতৃকুলের তেজী রক্তকণিকা পিতৃকুলের নিস্তেজ রক্তের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল।

আকাশবিজয় মাঝে মাঝে ভাবে, বিয়ে করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা যদি কোনোদিন তার হয় তাহলে আদিম বন্য রক্তধারা কোনো মেয়ের মধ্যে থাকলে তেমন কাউকে বিয়ে করলে তার সন্তান বোধহয় পলি পড়ে যাওয়া ধমনীতে একটা ঢল নামা স্রোতের আস্বাদন পেতে পারে। দিগ্বিজয় এবং আজকাল দেখে মনে হয় কল্যাণীর মধ্যেও কিংবা তাদের বাবা পৃথ্বীবিজয়ের মধ্যে এই জাতীয় কোনো রক্ত এসে মিশেছে।

ভোগের ঘর, যাকে বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তার পাশে লাগানো কিছু বেলফুল গাছ বড়সড় হয়ে উঠে অনেক ফুল ধরেছে। অচ্যুত বলেছিল, ফুল হবে না। এইসব পুরোনো মাটিতে সার না দিলে নাকি ফুল হয় না। বলেছিল, তার চাইতে একটা মানিপ্ল্যাণ্ট গাছ এনে লাগিয়ে পরীক্ষা করতে। যদি পাতা বেশ বড় হয়ে ওঠে, বুঝতে হবে এই বংশের সুদিন ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ ওর কথায় কান দেয়নি।

অচ্যুত আজকাল ঘনঘন এ-বাড়িতে যাতায়াত করে। অনেক সময় আকাশের কাছেও আসে না। আকাশ জানে শকুন্তলার সঙ্গে তার একটু ভাবসাব হয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না।

প্রতিবাদ করার কত বাধা। প্রথমত অচ্যুত সত্যিই তার বন্ধু। বন্ধু বিচ্ছেদ সে চায় না। দ্বিতীয়ত শকুন্তলাকে কিছু বললে সে ফোঁস করে উঠবে। আজকাল তার কথায় বেশ ধার হয়েছে। এ-ধরনের কথা এই বংশে আগে কোনো মেয়ের মুখে শোনা যেত না। তাদের রাগ দেখাবার ভঙ্গিও ছিল কত সংযত। শকুন্তলার কথার ছিরি সেই ধূমাবতী নাট্য কোম্পানীর মুকুলরাণীর মতো অনেকটা।

মুকুলরাণী বছরখানেক পরে দ্বিতীয়বার এসেছিল আব একদিন। সেদিন চুলে কলপ লাগিয়ে পরিপাটি হয়ে খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বার হচ্ছিল প্রশান্তবিজয়। এই বেলফুল গাছগুলোর কাছাকাছি আসতেই আঁতকে উঠেছিল। মুখ দিয়ে তার নিশ্চয় বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ বার হয়েছিল। নইলে আকাশবিজয় বৈঠকখানার ভেতর থেকে ছুটে বার হয়ে আসবে কেন? দেখল মুকুলরাণী দুই কোমরে হাত রেখে নাক ফুলিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে।

প্রশান্তবিজয় বলে উঠেছিল—একি! তুমি? এতদিন পরে।

হ্যাঁ, আমি। অবাক হচ্ছেন নাকি? বহুদিন হয়ে গেল বৈকি। তবু ভুলিনি আপনাকে।

অ্যাঃ, এখানে কেন? চল চল।

না। এখানেই হবে।

না না। সে কি! তুমি তো জান ধূমাবতীর চেয়ে এরা বেশি দেয়।

মিথ্যে কথা। তুমি আমার ভয়ে পালিয়ে এসেছ।

হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধনে প্রশান্তবিজয় চমকে ওঠে। সে ঘাড় ফিরিয়ে দোতালার খড়খড়ির দিকে সভয়ে তাকায় একবার।

মুকুলরাণী, তোমার ভয়ে আমি পালাব কেন? তুমি আমার চেয়ে কত ছোট। কম করে পনেরো বছরের তো হবেই। ভেবে-ছিলাম এতোদিনে আমাকে ভুলে গিয়েছ।

কেঁদে ফেলে মুকুলরাণী বলে—বয়সই বুঝি সব। আমার মন দেখলে না? তোমাকে আমি জীবনেও ভুলব না। তুমি আমার জন্মান্তরের—

আহা, এ তো বড় মুশকিল।

সেই সময় আকাশ পরিত্রাতার ভূমিকায় এগিয়ে এসে দৃঢ়ভাবে বলে—কাকা, আপনাদের যাত্রার রিহার্সেলটা ওই ঘরের মধ্যে গিয়ে করলে হয় না? সুচিত্রা কাকী যে দেখে ফেলবেন!

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বরং চল।

মুকুলরাণী কোমর দুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে বলে—না। আমি আজ চলে যাচ্ছি। কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে তুমি যদি ধূমাবতীতে না ফিরেছো, তবে আবার আসব। কিংবা গলায় দড়ি দেব। আর যদি গলায় দড়ি দিই, তাহলে তোমার নামে ভালরকম লিখে যাব।

মুকুল শোন—মুকুল—

ততক্ষণে মুকুলরাণী হন হন করে চলে গিয়েছিল।

প্রশান্তবিজয় বেকুবের মতো কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে বলে—ওটা কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল রে? দেখতে পাইনি তো?

আমিও দেখিনি।

মহা মুশকিল। যাত্রা ছেড়ে দিলে খাব কি? ধূমাবতী নিশ্চয় একে লেলিয়ে দিয়েছে। বুঝলি। আমি ওদের দলে গেলে লাভ হয় বেশী।

আকাশ বলে—তাই কি?

প্রশান্ত চমকে উঠে। বিড় বিড় করতে করতে চলে যায়।

সেদিন মুকুলরাণীর আবির্ভাব সুচিত্রা কাকীর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল। অথচ এই সুচিত্রা কাকীই স্বামী বাড়ির বাইরে যাবার সময় খড়খড়ি তুলে রাস্তার মোড় অবধি তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকত। তারপর মোড় ঘুরলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দুহাত কপালে ঠেকিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত, স্বামীর যাত্রাপথ নিরাপদ রাখার জন্য। ছোটবেলায় আকাশবিজয় নিজেই কতবার দেখেছে। সে সব দিনে সুচিত্রা কাকী সরুচাক্‌লি কিংবা পাটিসাপ্‌টা তৈরি করলে প্রায়ই তাকে চাখতে ডাকত।

বেলফুল গাছের পরিচর্যার সঙ্গে সঙ্গে নানান দিনের নানান ছবি

চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হঠাৎ বাইরে বিরাট কলরব। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে একটা ফিকে সবুজ রঙের বিরাট লম্বা বিদেশী মডেলের প্রাইভেট কার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আর তাকে ঘিরে অন্তত জনা বিশেক ছেলে-ছোকরা। আরও অনেক উন্মাদের মতো ছুটে-আসছে। সত্যবিজয়ের গাড়ি এটা নয়। কে এলো ?

গুনগুন আওয়াজ উঠছে—অপ্সরা দেবী। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সবাই। বিরক্ত মুখে গাড়ি থেকে কোনোরকমে একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বার হয়ে এসে আকাশবিজয়কে দেখে বলে—আপনি এ-বাড়ির কেউ ?

হ্যাঁ।

অনন্তবিজয় মুখোপাধ্যায় বেঁচে আছেন ?

হ্যাঁ।

আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তাঁকে খবর দেব ?

না না। তিনি নিচে নামবেন কেন ? আমি আর আমার মেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

আকাশ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বলে—অত ভিড় করছে কেন ওরা ?

সিনেমা আর্টিস্ট বলে। তার ওপর বম্বের অপ্সরা দেবী তো। তিন তিনটে বই পর পর হিট্।

আকাশবিজয়ের মনের ভেতরে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক বছর আগে চপলাসুন্দরী জীবিত থাকার সময়ের অস্পষ্ট ঘটনার কথা ভেসে উঠল। খবরের কাগজে সিনেমার পৃষ্ঠায় একটি মেয়ের ছবি।

সে বলে—আপনি কি বিক্রমবিজয় মুখোপাধ্যায় ?

হ্যাঁ। আশ্চর্য ! তুমি চিনলে কি করে ?

চপলাসুন্দরী অনেক কিছু চিনিয়ে দিয়েছেন।

চপলাসুন্দরী ? তিনি এখনো বেঁচে আছেন ? না না, তা হবে কি করে ?

তিনি মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হলো।

তোমার নাম কি?

আকাশবিজয়।

দাঁড়াও আকাশ। মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনি।

অপ্সরা দেবী ওরফে মদালসার সত্যিই গ্ল্যামার আছে। এত রূপসী নায়িকা এখন বম্বেতে একজনও নেই। আকাশের অদ্ভুত ধরনের এক চিন্তা মাথার মধ্যে আসে। মরমী যদি ঠিকমতো মানুষ হতো তাহলে এই মেক-আপ দেওয়া মদালসার চেয়ে কোনো অংশেই কম হতো না। মরমীর গায়ের রঙ ছিল মোমের মতো। ওই রঙ সাধারণ ঘরে পুড়ে যায়। মোমবাতির মতো মরমীর রঙ পুড়ে গিয়েছে। তেমন ঘরে পড়লে ওই রঙ আরও খোলতাই হতো। আকাশ মনে মনে প্রার্থনা করে, মরমী যেন ভুলেও মদালসার পাশাপাশি না আসে।

বাড়ির সবাই ভিড় করল অনন্তবিজয়ের ঘরের সামনে। বিক্রমবিজয় আকাশের সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে ঢুকছে ওই ঘরে। অনন্তবিজয় যথারীতি খাটে বসে ঢুলছিল। সামনে একটা পুরোনো তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খোলা রয়েছে। এতে মুখোপাধ্যায় বংশের একশো বছর আগের এক দুর্গোৎসবের বর্ণনা রয়েছে। মাঝে মাঝে উল্টেপাল্টে দেখে অনন্তবিজয়। নতুন মানুষদের ঘরে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। ভাবে, বাড়ি কেনার নতুন খরিদ্দার।

আমি বিক্রম, কাকামশায়।

নিজে পদধূলি গ্রহন করে মেয়েকে প্রণাম করতে বলে।

তোমাকে চেনা যায় না। এখন কোথায় থাকো?

বম্বেতে।

ও হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে। এই বুঝি মেয়ে?

হ্যাঁ, মদালসা। ও তো—

শুনেছি। এ তো বড়। ছোটটি কি করে?

ওর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

খুব ভাল। ওখানে পাল্‌টি ঘর পেয়েছে তাহলে ?

আজ্ঞে একজন মারাঠীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। ছেলেটি অবশ্য ব্রাহ্মণ।

বুঝেছি। বসো। তুমি আমার বড়দার ছেলে। খুবই আপন। সব যেন কেমন হয়ে গেল। আগেকার দিন হলে তোমাকে সত্যকে জুতোপেটা করে বার করে দিতাম। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় তোমরাই বোধহয় ঠিক। ওই তো অমরের মেয়েটিকে দেখছি। কী কপাল।

মদালসা বলে—আমাকে আর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও বাবা।

আমি কি আর চিনি রে? আকাশ, তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও।

বাইরে রাস্তায় ততক্ষণে প্রায় দুশো মানুষের জনতা জমে উঠেছে। কিছু কিছু লোক একটু ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। তাদের ধারণা এই পুরোনো বাড়িতে বোধহয় শুটিং হবে। কেউ কেউ মন্তব্য করছে, স্টুডিওতে কি আর এমন বাড়ি পাবে?

অনন্তবিজয় আকাশকে হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলে, বালিশের নিচ থেকে একগোছা চাবি বার করতে করতে বলে—এতদিন পরে এলে একটু মিষ্টি মুখ করতে হয়।

না না, কাকামশায় অনেক খেয়েছি। মিষ্টি তো আমারই আনা উচিত ছিল। কিন্তু সে তো ভদ্রতা। আমাদের সম্পর্ক রক্তের। যেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকি না কেন শিকড়টি তো এখানে। আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি। এ-বংশে এখন আপনিই প্রবীণতম।

তুমি ঠিকই বলেছ বিক্রম। তবে শিকড় এখানে থাকলেও, এ মাটিতে আর রস নেই। তাই তোমাদের ইতিমধ্যে যদি বটের ঝুরির মতো নতুন শিকড় না গজাতো তাহলে আমাদের মতো শুকিয়ে

মরতে হে। আমাদের চিন্তামণি গোয়ালার কথা মনে পড়ে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ মনে পড়ে। তার ছেলে লক্ষ্মী তো প্রায় আমারই সমবয়সী।

সেই লক্ষ্মীর আজ বিরাট মিষ্টির দোকান। শুনলাম ভবানীপুরে ব্রাঞ্চ খুলছে।

আকাশ ঘরের মধ্যে এক একজন করে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেয়। মদালসা বয়স্ক প্রত্যেককে প্রণাম করে। বধূরা আসে ঘোমটা টেনে। অনন্তবিজয় জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে বধূদের যাতে অসুবিধা না হয়। মদালসার কাছে মনে হয় এ-বাড়ির বধূরা, এমনকি শকুন্তলা ও কল্যাণীও যেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। অথচ পাড়ায় এদেরই রূপের খ্যাতি আছে।

সবাই এলো, এলো না শুধু সুচিত্রা কাকী। যাত্রায় অভিনয় করে বলে স্বামীর প্রতি সে শ্রদ্ধা হারিয়েছে বহুদিন। তেমনি মদলসার যত খ্যাতিই থাক, সুচিত্রা কাকীর কাছে সে ঘৃণ্য।

না। মরমীও আসেনি। আকাশের মনোভব বুঝতে পেরেছিল কিনা কে জানে। কোথায় গিয়ে যেন লুকিয়েছে সে। কেউ খোঁজ করল না। আর এলো না তার বাবা অমরবিজয়। তাকে ডাকতে গেলে সে চেঁচিয়ে ওঠে—কে? এসেছে? বিক্রম? সে আবার কে? ডেকে আনো তাকে। আমার অনেক কাজ। চাঁদপাল ঘাটে আজ জাহাজ আসবে। প্রিন্স দ্বারিকাও যাবেন।

চপলাসুন্দরীর কাছে বংশের পুরোনো ইতিহাস শুনে শুনে অমরের মনে এমন প্রভাব পড়েছিল যে পাগলামির মুহূর্তে কখনো কখনো সে সেই সময়কার মুখোপাধ্যায় বংশের বেনীয়ান হিসাবে নিজেকে ভাবতে শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত এই পুরোনো বাড়ির প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অনন্তবিজয় গম্ভীর হয়ে বলে—সত্য মাঝে মাঝে এসে টোপ ফেলে যায়। ওর গা দিয়ে এখন যেন চামড়ার গন্ধ বার হয়।

শুনে বিক্রমবিজয়ের মুখে এক ঝলক রক্ত খেলে যায়। সে বলে

—কী বলে সত্য ?

বলে বাড়িটা তাকে বিক্রি করে দিতে। ভাল দামই দিতে চায়। এমনকি আমাদের জন্যে বাড়ি তৈরি করে দিতেও রাজী। ওই ধাপার দিকে। বুঝলে হে ধাপায় পাঠাতে চায় আমাদের।

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বিক্রয় বলে—ওদিকটা বেশ উন্নত হয়ে উঠেছে কিন্তু। বলতে গেলে সল্ট লেকের লাগোয়া।

অর্থাৎ তুমিও চাও বাড়িটা আমি ধ্বংস করে দিই।

এ বাড়ি ধ্বংস হবেই কাকামশায়। আপনি হয়ত আপনার জীবনটা কোনোরকমে কাটিয়ে যেতে পারবেন। তারপর আর থাকবে না।

জানি, তুমি একথা বলতেই এসেছ, তাও জানি। সত্যর গায়ে চামড়ার গন্ধ আর তোমাদের গায়ে ব্যভিচারের গন্ধ।

কী বলছেন কাকামশায় ?

ঠিক বলছি। আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে যেও না। এই বংশে জন্মে মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছ একদল নেকড়ের মধ্যে।

মদালসা সোজা উঠে দাঁড়িয়ে বলে—চল বাবা। এইসব অপমান সহ্য করে বংশের প্রতি মমতা দেখাতে হবে না। তোমার জন্যে একটা পার্টি নষ্ট হলো।

বিক্রমবিজয় মেয়ের কথায় যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ায়! তারপর সুড়সুড় করে ঘর থেকে বার হয়ে যায় তার পেছনে পেছনে।

একটা নাটকের আকস্মাৎ যবনিকাপাত ঘটে গেল যেন।

অনন্তবিজয় সজোরে খাটের ওপর দুলতে থাকে।

নিচে তখন বিশ্রী অবস্থা। লোকে লোকারণ্য। আকাশবিজয় মদালসাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সে নিজেকে উন্নত পর্যায়ের দার্শনিকের মতো ভাবে। সব ব্যাপারেই নির্লিপ্ত। দাদুর অযথা বিস্ফোরণ আর তাতে এদের প্রতিক্রিয়া—কিছুতেই কিছু এসে যায় না তার। কারণ প্রতিকারের কোনো উপায় তার জানা নেই।

অপ্সরা দেবীর ফ্যানেরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করলেও পথ

করে দেয় ভিড়ের মধ্যে। স্লোগান ওঠে—অপ্সরা যুগ যুগ জিও।

গাড়ির কাছে পৌঁছে মদালসার আকাশের প্রতি বোধহয় অনুকম্পা জাগে। এতক্ষণ দেখেছে, দেখে বুঝছে নিছক ভালমানুষ একজন। তাই বলে—তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট আকাশ। তাই নাম ধরে ডাকলাম। তোমার নেমন্তন্ন থাকল বম্বেতে যেও। ভালই হবে তোমার। কিছু প্রটিন আর ভিটামিন চার মাসেই চেহারা পাল্টে যাবে দেখো। তখন তোমার সামনে ভাল সুযোগ আসবে।

সিনেমা?

তাছাড়া কি?

আকাশ হেসে ওঠে।

কে একজন মন্তব্য করে—ইস্, আমাকে চান্স দেয় না।

আর একজন বলে—অপ্সরা বাঙালী না কিরে? আমাদের ঘরের মেয়ে বল্। আমি এ্যাদ্দিন ভাবতাম তেলুগু দেশম্।

আকাশের কাছে সবটাই একটা সিনেমার দৃশ্য। নাম তার আকাশ হলেও সে পাতালের কথা ভাবতে শুরু করে। আর সেই সময় তার চোখের সামনে বিদেশী মডেলের ফিকে সবুজ রঙের গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে হুস্ করে বার হয়ে যায়। কার নিক্ষিপ্ত একটা রজনীগন্ধার মালা গাড়ির বনেটের পাশে ঝুলতে থাকে।

নায়িকা চলে গেলে সবাই আকাশকে ঘিরে ধরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে।

কেন, এসেছিল মশায়?

আপনার চেনাশোনা দেখলাম।

গ্র্যাণ্ড অফার তো পেয়ে গেলেন। চলে যান। মিস্ করবেন না।

আবার আসবেন নাকি?

উনি কি শূটিং-এর স্পট ভিজিট করতে এসেছিলেন? 'স্বর্গলোক' পত্রিকায় দেখলাম, উনি নাকি প্রডিউসার হয়ে আসরে নামছেন এবার। সত্যি নাকি?

আকাশবিজয়ের কান ঝালাপালা হয়ে যাবার উপক্রম। ভাবে, মদালসার কী ঝামেলা সহ্য করতে হয়। তার ব্যাকওয়াশেই যা অবস্থা।

বলুন না মশায়। খুব ফাঁট নিচ্ছেন দেখছি।

আকাশ তাড়াতাড়ি বলে—এ-বাড়ির সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল এককালে।

এ্যাঁ, তাই নাকি ? তা হতে পারে। ঠিক আন্দাজ করেছিলাম। কিছু সাহায্য করে গেলেন বোধহয় ? আগের স্বামী বুঝি এই বাড়িতেই থাকেন ?

আকাশের কান লাল হয়ে যায়। সে বলে—না, ও এই বাড়ির মেয়ে।

ওই হলো। পালিয়ে গিয়েছিলেন ? বিধবা ছিলেন বুঝি ?

আজ্ঞে না, কুমারী। ওর বাবার সঙ্গে এসেছিল। ওর বাবা তাঁর কাকামশায়ের সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

সাক্ষাৎ কাকা ? এ-বাড়িতে থাকেন ? ওর ব্বাস্।

ওরা নিজেদের মধ্যে জোর গবেষণা শুরু করলে আকাশ অন্যদিকে সরে পড়ে। বাড়ির মধ্যে না ঢুকে ভিড়ের পেছনে চলে যায়। কেউ আর তাকে খুঁজে পাবে না।

একটু পরে ভিড় মিলিয়ে গেলে, বাড়ি ঢুকতে মরমীর সঙ্গে দেখা।

আকাশ জিজ্ঞাসা করে—কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ ?

লুকিয়ে ছিলাম। লজ্জা করে।

দেখেছিস ?

হ্যাঁ। খুব সুন্দর।

তোর চেয়েও ?

মরমী উষ্ণ ভাবে বলে—তোর মাথার ঠিক নেই।

আর কিছু বলে না আকাশ। বলতে ইচ্ছে হয় না। মরমীর মুখের নীল নীল শিরাগুলো ভেসে রয়েছে। আগের সেই সুন্দর

বাদামী রঙের চোখের তারার স্বচ্ছতা আর নেই। ভ্রূভঙ্গি করার মতো সজীবতাও হারিয়ে ফেলেছে সে। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের স্নায়ুগুলো ঠিকমতো বোধহয় কাজ করে না। কেমন অবশ অবশ ভাব। সে যেন এক মরুভূমি অতিক্রম করে চলেছে যার অন্ত নেই এবং সে জানে যে মরুভূমিতে একটিও মরূদ্যানের অস্তিত্ব নেই। তবু তাকে চলতে হচ্ছে। থেমে থাকার চেয়ে চলায় তবু সামান্য নতুনত্ব রয়েছে। আর এইভাবে চলতে চলতে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে যাওয়াই ভাল।

কত লোক জমেছিল, দেখেছিস মরমী?

হ্যাঁ! সবাই চেনে যে। কাগজে কত ছবি বার হয়। কত পোস্টার পড়ে রাস্তায় রাস্তায়। আমিও তো দেখেছি। তখন কি জানতাম? ছবির চেয়েও ওকে দেখতে অনেক ভাল।

চপলাসুন্দরী ঠিক চিনেছিলেন কিন্তু। তখন অবশ্য নাম করেনি।

নাম পাল্‌টালো কেন রে? মদালসা নামটা ভালই ছিল।

ওসব কি নিজের ইচ্ছেমতো হয়? এখানে পড়ে না থেকে ভালই করেছে। কি বলিস?

মরমী একটু চুপ করে থেকে বলে—হ্যাঁ। ভালই করেছে। কী হতো পড়ে থেকে। চপলাসুন্দরী আমাদের ঠকিয়ে গিয়েছেন।

এ কথা শুনে আকাশ স্তব্ধ হয়ে যায়। মরমীকেই সে চপলাসুন্দরীর একমাত্র প্রতিনিধি বলে জানত। নরেনবাবু তার সেই আদর্শকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখন নিশ্চয় সে সেকেলে সতীদাহের জয়গান করবে না আর। তবু চপলাসুন্দরীর গায়ে এতটা কাদা ছেটানো বোধহয় ঠিক হয়নি মরমীর। চপলাসুন্দরী তাঁর যুগের তুলনায় যথেষ্ট উদার ছিলো। অনেক কিছুকে মেনে নিয়ে ফোকলা হাসি হাসতে পারতেন।

কল্যাণী খুব দ্রুত কেমন পাল্টে যাচ্ছে। তার মুখে ফুটে উঠছে

দাদা দিগ্বিজয়ের কাঠিন্য আর ব্যক্তিত্ব। আজকাল কল্যাণীর সঙ্গে দাদাগিরি ফলিয়ে ভালভাবে কথা বলা যায় না। বাধো বাধো ঠেকে। ওকে এভাবে পালটে যেতে দেখে আকাশবিজয়ের কেমন কষ্ট হয়। মেয়েদের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে সে সহ্য করতে পারে না। মরমীর বিয়ের পর শকুন্তলার সঙ্গে কল্যাণীর যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেই ঘনিষ্ঠতা আর নেই। শকুন্তলাকে এড়িয়ে চলতে চায় সে। অথচ শকুন্তলা কত স্বাভাবিক। ঠিক অন্য পাঁচটা মেয়ে যেমন হয়। এই বয়সে এ-বাড়ির মেয়েদের দুই গণ্ডে লালের যে আভাস ফুটে ওঠে শকুন্তলার গালে তা দেখা যায়। কল্যাণীর সে বালাই নেই। একটা রুক্ষতা বিরাজ করছে সর্ব অবয়বে। কলেজে সে যায়। কিন্তু শুধু কলেজেই নয়—আরও কোথাও যেন যায়। তার সহপাঠীরা যখন এ পথ ধরে বাড়ি ফেরে সে তাদের সঙ্গে থাকে না। অনেক পরে একা একা আসে। কোথায় যায়?

এই কল্যাণী, শোন।

ব্যস্তভাবে বার হয়ে যাচ্ছিল কল্যাণী সেদিন। আকাশ বাধা দেয়।

বল।

শকুন্তলার সঙ্গে আড়ি নাকি রে তোর?

তুমি দেখছি এখনো আড়ি আর অভিমানের যুগে পড়ে আছো আকাশদা।

যুগটা পালটেছে, সে খবর আমি পাইনি।

কল্যাণী এগিয়ে যেতে যেতে বলে—খবর-টবর নাও আগে।

এই শোন, অত তাড়া কিসের?

কাজ আছে। তাড়াতাড়ি বল।

শকুন্তলার সঙ্গে মিশতে দেখিনে, তাই বলছি।

শকুন্তলাদির তাতে অসুবিধে।

কেন?

জানিনে। তোমাকে অনন্তবিজয় বাড়ির গার্জেনশিপ দিয়ে

দিয়েছেন নাকি মরার আগেই ?

চমকে ওঠে আকাশ—কেন ? একথা বললি কেন ?

বাড়ির সব ব্যাপারে কৌতূহল দেখছি কিনা। অথচ তুমি অন্ধ, অনন্তবিজয়ের মতোই। বাড়ির আনাচে-কানাচে সুন্দর সুন্দর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চোখে পড়ে না তোমার। যেমন অনন্তবিজয় তেমনি তুমি। জোড়া ধৃতরাষ্ট্র। তোমাদের সঞ্জয় নেই। চপলাসুন্দরীর কাছে নাকি মহাভারতের গল্প শুনতে খুব ?

আকাশবিজয় স্তম্ভিত। এ কি শুনেছে সে ? এ কোন কল্যাণী ? এ যে তাকে রীতিমত তাচ্ছিল্য করে, বোধহয় ঘৃণাও করে। সে নিজে জানে, সে অতি সাধারণ। তাই বলে একেবারেই অপদার্থ নাকি ?

ধীরে ধীরে বলে—ধৃতরাষ্ট্র কিনা জানি না। তবে অতি সাধরণ একজন মানুষ। তাই তোদের ওপর সাধারণ মানুষের মতো স্নেহ-মমতা এখনো রয়েছে।

জানি, তবে সেই স্নেহ-মমতা কাছে না টেনে একটু দূরে ঠেলে দেবার চেষ্টা করুক। তাতে মানুষ হতে সুবিধা। দুদিন পরে তো বাড়িতে গেল গেল রব উঠবে। অথচ যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপারই নয়।

একথা বললি কেন ?

মৃদু হেসে কল্যাণী বলে—এমনি। দাদার ছবি তো এখনো তোমার টেবিলে। ফুল দিতেও ভুল হয় না দেখি। পুজোটা ওভাবে না করে দাদার মতো হবার চেষ্টা করলে হয় না ?

তুই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস বলে মনে হচ্ছে না তোর ?

হচ্ছে। তবে কিছু এসে যায় না। আমাদের পায়ের নিচে কোনো মাটিই নেই। কোনো কিছুই আমাদের বাড়াবাড়ি নয়। আমাদের হারাবার ভয় নেই।

কল্যাণী চলে যায়। আকাশবিজয়কে ভালরকম ধাক্কা দিয়ে যায়। এই সেদিনই মেয়েটা এতটুকু ছিল—এত কথা শিখল কবে ?

শুধু কথা নয়। প্রতিটি কথার পেছনে ভালরকম যুক্তি আছে। মনে পড়ে শৈশবে আকাশদার হাত ধরে ইস্কুলে যাবে বলে গোঁ ধরে বসে থাকত কল্যাণী।

আকাশ বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ভাবতে বসে। কল্যাণী ভুল ভেবেছে। অনন্তবিজয়ের মতো খবরদারি করার বিন্দুমাত্র স্পৃহা তার নেই। অনন্তবিজয়ের মতো গোঁড়া সে নয়, তবে খুব উদার হবার মতো বলিষ্ঠতাও তার নেই। বাড়িতে সকালের দিকে থাকে, তাই একে ওকে ডেকে ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করে। এটা হোটেল বাড়ি নয় যে সবাই সম্পর্কশূন্য হয়ে বসবাস করবে। সে দুপুরের আগেই তো খেয়ে দেয়ে ঘুরতে শুরু করে কাজের ধান্দায়। পরীক্ষা দিয়েছে গোটা কতক। কোনোটার ফল বার হতে দেড় দুবছর বাকি—কোনোটায় চান্স পায়নি। উঁচুদরের চাকরির জন্য পরীক্ষা দেবার সামর্থ্য তার নেই, না বুদ্ধিতে না পরিশ্রমে। তবু মরমীদের জন্যে সে দুটো টিউশানি করে। নইলে ওরা একেবারেই না খেয়ে থাকত। এই সময় দাদু যদি এ-বাড়ি বিক্রি করতে মত দিত তাহলে একটা আস্তানার সঙ্গে সঙ্গে মরমীদের জন্যে কিছু কাঁচা টাকারও ব্যবস্থা করতে পারত সত্যবিজয়ের কাছ থেকে।

বৈঠকখানায় বসেই আকাশ দেখে শকুন্তলা বার হচ্ছে। হঠাৎ যেন ওর রূপ খুব খোলতাই হয়েছে। চলনেও বয়ঃসন্ধির অস্থিরতা কেটে গিয়ে একটা ছন্দ এসে গিয়েছে। মেয়েদের বোধহয় এমনিই হয়।

এই শকুন্তলা।

চমকে ওঠে শকুন্তলা।

কিরে, অত ভয় পেলি কেন ?

তাকে দেখতে পেয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলে—ও তুমি। আমি ভাবলাম—

কি ভাবলি ? ভূত না দানো। অবিশ্যি আমি ভূতই।

যাঃ। এখানে বসে আছো কেন আকাশদা ?

তুই কোথায় চললি? হাতে যে বই নেই।

আজ কলেজে যাব না।

অত ফাঁকি দিস না।

বাব্বাঃ, তুমি দেখছি অনন্তবিজয়ের ঠাকুর্দা।

আকাশ চোট খায়। শকুন্তলার কথায় কল্যাণীর কথার ঝাঁঝ না থাকলেও বিগলিতার্থ একই।

কল্যাণীর সঙ্গে তোকে আজকাল দেখি না কেন রে?

কল্যাণী? সে তো বিরাট লীডার। কলেজে মেয়ে ক্ষেপায়। সবাই ওকে সমীহ করে।

ও কি পার্টি করে?

ওর এখনো কোনো পার্টি নেই। আমি জানতে চেয়েছিলাম একদিন। বলল, সবাই কোনো না কোনো সময়ে আপোস করে। সব পার্টিই সমান। ও আপোসহীন সংগ্রাম চায়।

সে তো শুনি সব পার্টিই চায়।

ও বলে, ভুয়ো।

একটা পার্টিকে ধরতে হবে তো?

বলে একা চলবে।

ভাল কথা। তা তোর সঙ্গে এত ভাব ছিল—

শকুন্তলার মুখে একটু আবীর ছড়ায় যেন। বলে—চলি আকাশদা—

চলে যায় সে। মনে হলো, খুব তাড়া আছে।

অনন্তবিজয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোন রোগ নয়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল এক ঘটনায়। ফলে প্রেসার খুব বেড়ে গিয়েছে। অথচ আগে কখনো রক্তচাপের জন্যে কোন অসুবিধা হয়নি রাত্রের ঘুমও বয়সের তুলনায় ভালই হতো। খাওয়া দাওয়া এমনিতে কম করলেও, কোন বাধানিষেধ ছিলনা।

এক মাড়োয়ারী এসে অনন্তবিজয়কে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল।

মাড়োয়ারী, গুজরাতী হামেসাই আসে। বাড়িটার দুর্দশা দেখে কেউই লোভ সামলাতে পারে না। তার ওপর দালালরা আছে। যদি লেগে যায় মোটা টাকা পাবে। অনন্তবিজয় সবার সঙ্গে যতটা সম্ভব সংযত আর ভদ্র ব্যবহার করে। এমনিতে কথা বেশী হয় না। পাঁচ মিনিট, বড়জোর দশমিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে দেয় অনন্তবিজয়।

কিন্তু এই মাড়োয়ারী এসে অনন্তবিজয়ের আসল জায়গায় আঘাত দিয়েছে। পাঁচমিনিট কথা বলেই একটা ভারী সাদা কাগজে জড়ানো বাণ্ডিল অনন্তবিজয়ের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—আমি চলি মুখার্জিবাবু। একমাস পরে আসব।

অনন্তবিজয় বিস্মিত হয়ে বলে—এটা কি !

আরে ওটা আপনি রাখুন। ওটা আপনারই। বাড়ি বিক্রির টাকা আলাদা। ওতে তিন লাখ আছে।

অনন্তবিজয় খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে নোটের বাণ্ডিল তুলে ধরে মাড়োয়ারীর মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কাঁপতে থাকে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা বার হয় না। আকাশ আর প্রশান্তবিজয় সেখানে ছিল। তারা কি করবে বুঝতে পারে না। মাড়োয়ারী ইতিমধ্যে বাণ্ডিলটি নিয়ে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মত সিঁড়ি দিয়ে থপাস্ থপাস্ করে নামতে নামতে রাস্তার গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

অনন্তবিজয়ের মুখ দিয়ে খালি বার হয়েছিল,—ঘুষ ! টাকার লোভ দেখাচ্ছে ?

বলেই খাটের ওপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আকাশ বুঝতে পারে দাদুর এ-ভাবে শুয়ে পড়াটা স্বাভাবিক নয়।

প্রশান্তবিজয় ঝুঁকে পড়ে বলে,—অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। ডাক্তার ডাকতে চললাম।

আকাশের মায়ের কথা কখনো শোনা যায় না। সে এসে এক ঝলক দেখে শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে দেখে পা ঠাণ্ডা। বলে,— আমি গরম জল বসিয়ে রাখছি। দরকার হতে পারে।

আকাশ ভাবে, দাদু বাঁচবে তো? এ যেন বিরাট বটগাছ উপড়ে পড়ল। ঠিক তাই মনে হয়েছিল আকাশের। বটগাছে কত পাখীর আস্তানা থাকে। দাদু যদি না বাঁচে, নিজেকে বেশ অসহায় বলে মনে হবে কিছুদিন। মা যদি এত চুপ করে না থাকত, যদি হেসে কথা বলত, সবার সঙ্গে মিশত, তাহলে আকাশ অনেকটা স্বস্তি পেত। কিন্তু মা তেমন নয়। আগে নাকি খুব হাসিখুশী ছিল। প্রশান্ত-বিজয় বলেছে। কিন্তু বাবার আকস্মিক মৃত্যুতে একেবারে পালটে গিয়েছে। বাবার সঙ্গে মায়ের বয়সের তফাৎ একটু বেশী ছিল। বলতে গেলে প্রায় কিশোরী বয়সেই সে বিধবা হয়। প্রশান্তবিজয় আর অমরবিজয়ের স্ত্রীদের চেয়ে মায়ের বয়স কম—অথচ মাকে তারা দিদি বলে ডাকে। কারণ সমরবিজয় অমরবিজয়ের চেয়ে কয়েক মাসের বড় ছিল। প্রশান্তবিজয়ের চেয়ে বছর দেড়েকের বড়।

ডাক্তার আসছে না। প্রশান্তবিজয় কোথায় খুঁজতে গিয়েছে কে জানে। পাশের গলির রায় ডাক্তারকে ডাকলেই হতো। মা একবার ঘরে ঢুকে দাদুর দিকে একপলক তাকিয়ে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে,—আকাশ, বেঁচে আছেন তো?

আকাশ চমকে উঠে বলে,—কেন, কেন?

নিঃশ্বাস পড়ছে না যে।

আকাশ তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে দাদুর পাশে গিয়ে বসে খুব আলগোছে বুকের বাঁদিকে হাত রাখে। হৃদপিণ্ড সচল। সে একদিকে ঘাড় হেলিয়ে ইসারায় মাকে বলে, বেঁচে আছে। তারপর বিছানার চাদর থেকে একটা সুতো বার করে নিয়ে নাকের সামনে ধরে। হ্যাঁ, নিঃশাস পড়ছে। খুব আস্তে, বোঝাই যায় না। মা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে যায়।

আকাশ কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। দাদুর স্ট্রোক হয়নি তো? কিংবা হার্ট এ্যাটাক। সে-ও তো এমন হঠাৎ হয়ে যায়। সে দেখে দাদুর মুখ প্রশান্ত। ভাবনা চিন্তার লেশমাত্র নেই ওমুখে। তবে দীর্ঘদিনের আর্থিক অনটন আর নীতির লড়াই ওই মুখে এঁকে দিয়েছে

অসংখ্য বলিরেখা।

প্রশান্তবিজয় ডাক্তার নিয়ে ঘরে ঢোকে। রায় ডাক্তার নয়। একে চেনেনা আকাশ। বে-পাড়ার হবে নিশ্চয়। ডাক্তার ঢুকেই অনন্তবিজয়ের চোখের পাতা টেনে ধরে ভেতরটা দেখল। তারপর তাড়াতাড়ি ব্লাডপ্রেসার দেখবার আয়োজন করল।

ইতিমধ্যে ডাক্তার দেখে ঘরের তিনদিকের দরজায় বাড়ির সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। ছাদের দিকের দরজায় দেখা গেল অমরবিজয় এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে বিস্ময়। কোথা থেকে খবর পেল কে জানে। সবাইকে ছুটে আসতে দেখে বোধহয় চলে এসেছে।

ডাক্তার বলে,—ভেবেছিলাম স্ট্রোক হয়েছে। তা নয়। তবে প্রেসার বেশ উঁচুতে আছে। সাবধানে থাকতে হবে কিছুদিন। বয়স হয়েছে তো।

প্রশান্তবিজয় বলে,—ওঁর কিন্তু প্রেসার ছিল না।

ডাক্তার হেসে বলে,—প্রেসার সবারি থাকে। আপনি বলতে চাইছেন নর্মাল প্রেসার ছিল।

হ্যাঁ।

চেক-আপ না করালে অনেক সময় ধরা পড়ে না।

আকাশবিজয় ভাবে, এইবার ভিজিট দেবার সময় হয়েছে। সে প্রশান্তবিজয়কে ডাক্তারের সামনে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। প্রশান্তবিজয়ও কিছু বলছে না। অস্বস্তিতে পড়ে আকাশ। ইতিমধ্যে ডাক্তার প্রেসক্রিপসান লিখে বলে দেয়।

শেষে নিজে থেকেই বলে—আপনার ভিজিট—

হেসে ডাক্তার বলে,—আমি একবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে দেখে যাব। তখন ওসব হবে। একটু পরেই জ্ঞান ফিরবে মনে হয়।

আকাশবিজয় ডাক্তারের বাক্‌শোটা হাতে নিয়ে সদর দরজা অব্দি পৌছে দিতে গিয়ে দেখে একটা 'কনটেসা' গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ভাবে, ডাক্তারবাবুর নাকি? হ্যাঁ, তাই-ই। ডাক্তার গাড়িতে উঠতে, ড্রাইভার স্টার্ট দেয়। আকাশ হাঁ করে দাঁরিয়ে

দাঁড়িয়ে মৃদু পেট্রোলের গন্ধ শুকতে থাকে। কাকুর কাণ্ডজ্ঞান নেই। এই ডাক্তারের দুবারের ভিজিট যে কত হবে কে জানে। এদিকে দাদুর ওষুধপথ্য আছে। কোথা থেকে আনল একে?

প্রশান্তর কাছে গিয়ে আকাশ বলে,—ওই ডাক্তারকে কোথায় পেলে।

আরে পাড়ার সব ডাক্তারখানা বন্ধ। আজ রবিবার মনে নেই? রায় ডাক্তারের ডিসপেনসারি খোলা ছিল, কিন্তু তিনি একটু আগে পেসেণ্ট দেখতে বার হয়েছিলেন। কী করি। এমন সময় দেখি লাল ক্রশ মারা গাড়িখানা যাচ্ছে। কাকাবাবুর অবস্থা দেখে গিয়েছিলাম। মরিয়া হয়ে হাত তুললাম, ভাবলাম নিশ্চয় ডাক্তার আছে। ডাক্তার যে ছিল দেখতেই পেলি।

ডাক্তার রাজী হয়ে গেল আসতে?

রাজী না হলে আসবে কেন? তুই তো জানিস, আমি রাজা-গজার পার্ট করি। ওসব করতে করতে খোসামদ করা ভুলে গিয়েছি।

ডাক্তার খোলা মেজাজে ছিল বোধহয়।

থাকতে পারে। শুধু জিজ্ঞাসা করেছিল কোন বাড়ি। আর কিছু নয়। আমি আমাদের বাড়ির নম্বর বলেছিলাম। আর কথা না বলে উনি চলে এলেন।

উনি পাড়ার ডাক্তার নন। আশেপাশেরও নন। এম্‌নি জিজ্ঞাসা করেছিলেন বোধহয়।

তাই হবে।

তবে, মানুষটি ভাল। যেচে দুবার কেউ পেসেণ্ট দেখেন বলে জানিনা। কিন্তু দুবারের ভিজিট কত নেবেন কে জানে।

ভাবিস না। আমি কিছু টাকা পেয়েছি।

যদি দাদুর কাছে না থাকে তোমার কাছ থেকে নেব।

না। ভিজিটটা আমিই দেব ঠিক করেছি।

আকাশ আর কিছু বলতে পারে না

দাদু ধীরে ধীরে চোখ মেলে। চোখ দুটো সামান্য লাল। সেই

লাল চোখ দিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে থাকে।

প্রশান্তবিজয় বলে,—একটু চুপচাপ শুয়ে থাক।

কি হয়েছিল আমার।

এমন কিছুই হয়নি।

ওই লোকটা গেল কোথায়?

তখনি তো চলে গেল।

আমি রেগে জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম বুঝি?

কথাটা অনন্তবিজয় রসিকতা করে বলেনি। কিন্তু তার কথায় সবার মুখে আবছা হাসি ফুটে আবার মিলিয়ে যায়। রেগে গিয়ে মানুষ জ্ঞান হারায় বটে কিন্তু এ ধরণের জ্ঞান হারানো নয়।

প্রশান্ত আকাশের হাতে প্রেসক্রিপ্‌সানটা দিয়ে ওষুধ আনতে বলে।

অনন্তবিজয় লক্ষ্য করে বলে,—ওটা কি?

প্রেস্‌ক্রিপসান।

কে দিল!

ডাক্তার।

আমার জন্যে?

প্রশান্ত একটু ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেলায়।

আমাকে ডাক্তার দেখবে, তবে তো দেবে।

আকাশ বলে—দাদু, একটু চুপ করতো। ডাক্তার তোমাকে দেখে গিয়েছেন। রাত্রে আবার আসবেন, বলে গিয়েছেন চুপচাপ শুয়ে থাকতে। অত কথা বলো না।

ছাদের দরজার দিক দিয়ে সেই সময় অমরবিজয় ভেতরে ঢুকে বলে—চুপ করে থাকলে চলবে কি করে? আজ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়িতে বিধবা বিবাহের সপক্ষে আর বিপক্ষে তর্কযুদ্ধ আছে না? চুপকরে থাকলে চলবে? ওদের কথা শুনো না কাকাবাবু। সপক্ষীয়দের জিততেই হবে আজ।

অনন্তবিজয় অমরবিজয়কে কাছে ডেকে বসিয়ে বলে,—ঠিক

আছে। তুই কেমন আছিস।

আমি? আমি আবার খারাপ হলাম কবে? তুমি যখন ইস্কুলে যাবার জন্যে রাগ করতে তখন শুধু খারাপ লাগতো।

আকাশ ওষুধ আনতে চলে যায়।

রাতে ডাক্তার ঠিক এলো। আকাশবিজয়ের অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হলো। একই ওষুধ চলবে। তেল, ঘি, নুন বাদ দেওয়াই ভাল।

প্রশান্তবিজয় ইতস্তত করে বলে,—আপনার নাম কিন্তু এখনো জানিনা।

মৃদু হেসে ডাক্তার বলে, ডঃ নারায়ন মিত্র।

মনে মনে মাথায় হাত দেয় সবাই। এতবড় ডাক্তার! গাড়ি দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল। প্রশান্ত ভাবে, তার টাকায় কুলোবে তো। মহা মুসকিল। খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। তবু ভিজিটের প্রশ্ন থেকেই যায়।

প্রশান্তবিজয় বলে—আপনার ভিজিট—

ডঃ মিত্র হেসে বলে,—দরকার হবে না।

না, না তা হয় না।

অনন্তবিজয়ের আবার বোধহয় প্রেসার বেড়ে গিয়েছে ডাক্তারের কথা শুনে। ডাক্তারও অনুগ্রহ করতে চায়। সে বলে,—এবাড়ির যে অবস্থাই হোক, ভিজিট না দেওয়ার অবস্থায় পৌঁছতে চাই না আমরা। আপনার মত বড় ডাক্তারকে ওরা ডেকে খুব ভুল করেছে। কিন্তু ডেকেছে যখন ভিজিট আপনাকে নিতেই হবে।

পরিচিত জনের কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমি ভিজিট নিইনি।

পরিচিত? আপনি পরিচিত হবেন কি করে?

আমি বিক্রমবিজয়ের সহপাঠী ছিলাম। চপলাসুন্দরীর চোখে ধুলো দিয়ে অনেক নারকেল কুল খেয়েছি। আপনারা আমাকে চিনতে পারেন নি।

অনন্তবিজয় বিড়বিড় করে—নারায়ণ, নারাণ,—নাড়ু—। নাঃ তেমন কাউকে চিনি না।

ডাক্তার হেসে বলে—আমার ডাক নাম ঘণ্টু।

ও।

অমরবিজয় অবধি চিনতে পারে। বলে,—আমার পেন ভেঙে দিয়েছিল। এক পয়সার লটারীতে পেয়েছিলাম।

অমরবিজয়ের কথা শুনে সবাই তাজব। ডাক্তার যখন অমরবিজয়ের হালফিল অবস্থায় কথা শুনলো, সেও অবাক না হয়ে পারল না। শুধু ছোট্ট একটু মন্তব্য করল,—এই ব্যাধি সরিয়ে তোলা সম্ভব। উনি খুব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে নেই বলে মনে হয়।

মরমীদের আর্থিক অবস্থার সামান্য উন্নতিও এতদিনে করে দিতে পারলো না আকাশ। টিউশানি করে কতটুকু আর সাহায্য করা যায়। মরমীর এমন কিছু লেখাপড়া জানা নেই যে একটা চাকরির চেষ্টা করে। পারবেও না। চপলাসুন্দরীর আওতায় থেকে থেকে একেবারে ঘরকুনো। বাইরে বার হতে হলে কোন পুরুষ মানুষ দরকার। তার পেছু পেছু তাদের মত চলবে। একই রাস্তায় দশবার নিয়ে গেলেও একা একা সেই জায়গা চিনে যাবার সাধ্য নেই তার। এমন একটি মেয়ে নিজের পায়ে কী করে দাঁড়াবে। আকাশ অনেক মাথা ঘামিয়েছে. অচ্যুতের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। কিন্তু কুল কিনারা করতে পারেনি।

কল্যানী বাইরে যাচ্ছিল একদিন ব্যস্ত হয়ে, আকাশ তাকে কাছে ডাকে। ওকে ডাকতে ইচ্ছে হয় না, সয় সময় কেমন একটা উদ্ধত ভাব। হয়ত এযুগে এমনিই হতে হয়। শত হলেও সে দিগ্বিজয়ের বোন। সাধারন মেয়ে নয়। শকুন্তলার সঙ্গে আজকাল কথা বল মুশকিল। কেমন যেন অন্যমনস্ক। সিনেমা-থিয়েটারে যেমন দেখা যায়, তেমনি-সব ভাব ভঙ্গি। বাবার কাছ থেকে বোধহয় অভিনয় ক্ষমতা পেয়েছে টেয়েছে। আর বিক্রমবিজয়ের মেয়ে যদি অপ্সরা দেবী হতে পারে শকুন্তলাই বা কেন নায়িকা হতে পারবে না। তবে এ বাড়িতে থেকে সম্ভব হবে না। শুধু এ বাড়ি বলে কথা নয়, ওর

প্রধান বাধা ওর মা সুচিত্রার কাকী।

কল্যাণী একটু নম্র ভাবেই কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে—বল।

তোকে বলাটা ঠিক হবে কিনা জানিনা. তবু তুই অনেক জায়গায় ঘুরিস, তাই বলছি। আচ্ছা, মরমীর জন্যে ছোট-খাটো একটা কাজ জোটানো যায় না ? মেয়েরা যেমন কাজ করতে পারে ! তুই কি বলিস !

অন্য কেউ হলে জোটানো যেত, মরমীদি পারবে না কিছু।

কেন পারবে না, পেটের দায়ে কত লোক কত কি করে।

তুমি কি কিছু বোঝনা আকাশদা ? মরমীদি একা একা কোথাও যেতে পারে না। কাছেপিঠে কাজ পেলে ও আবার করবে না। বংশগৌরব আছে না ? তার চেয়ে যদি কখনো পারো হাতের সেলাই-এর কিংবা উল বোনার কল কিনে দিও। শিখে নিয়ে বাড়িতে বসে কিছু করতে পারবে। মোটা টাকা যোগাড় করতে হবে কল কিনতে গেলে। ব্যাংক কিংবা সরকার থেকে ঋণ দিতে পারে।

অবাক হয়ে কল্যানীর দিকে চেয়ে থাকে আকাশ।

কি দেখছ ?

তোকে। তোর কত বুদ্ধি হয়েছে। জগতটাকে কত বেশী চিনেছিস। দিগ্বিজয়দা থাকলে খুব আনন্দ হতো তার। আমারও হয়।

হয় বুঝি ? এখন চলি।

দাঁড়া। তোর এত বুদ্ধি, আর একটু পরামর্শ করব তোর সঙ্গে। মরমী তো শ্বশুর বাড়ি যেতে চায় না। এখানে এভাবে পড়ে থাকা কি ঠিক বলে মনে করিস ?

কোথায় যাবে তাহলে ? ওখানে গিয়ে অত্যাচার সইবে ?

কিন্তু স্বামীতো রয়েছে একজন।

ওটা আবার স্বামী নাকি। মরমীদির আর একটা বিয়ে দাও।

আকাশ স্তম্ভিত হয়—কল্যাণী, তুই বলছিস কি !

এই তো তোমার দোষ আকাশদা। সোজা জিনিষটা সহজে মেনে নিতে চাও না। আগের যুগের মত সমাধান খুঁজে বেড়াও।

আকাশ চুপ করে থাকে।

আর দাঁড়াবো না আকাশদা। আদালত থেকে ডিভোর্সটা করিয়ে নাও। কাজের কাজ হবে।

কল্যাণী চলে যায়।

আকাশের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে। কল্যাণীর কথাগুলো যতই বিপ্লবাত্মক বলে মনে হোক, সুষ্ঠ সমাধানগুলোর ইংগিত সে-ই দিয়ে গেল। মেয়েটার মগজ খুব সাফ্।

আকাশ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মাটির নীচের ঘরের কাছে ঝোপের মধ্যে মনে হলো একজন মানুষ নড়াচড়া করছে। কৌতূহলী হয়ে একপা একপা করে এগিয়ে দেখে মরমী কি যেন করছে। সে কাছে গিয়ে ডাকে।

মরমী চমকে ওঠে।

কি করছিস?

মরমী একটা হাত উঠিয়ে মেলে ধরে দেখায়। সেই হাতে একগোছা গাছের পাতা ধরে রেখেছে।

কী ওগুলো?

শাক।

কী শাক?

বেথো শাক।

সে আবার কি?

আছে রে আছে। লিলুয়ার বাজারে অবধি পাওয়া যায়।

নাম শুনিনি।

এখানে হয়ত অন্য নাম। ঘুরতে ঘুরতে বাজারে গিয়ে খোঁজ নিস।

বিষ নয় তো।

মরমী অদ্ভুত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চায়। বলে—হলেও ক্ষতি ছিল না। কত পরিবার তো একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। আমাদের কী-ই বা আছে?

বংশ ?

মরমী কেমন ক্লান্ত হাসি হাসে। সে আরও শাক তুলতে থাকে। বলে,—শাক হলে ভাত খাওয়া যায়।

আকাশ কথার খেই হারিয়ে ফেলে। সে চেয়ে চেয়ে দেখে যেভাবে সে নিজে চাঁপা ফুল তোলে, তার চেয়েও যত্নের সঙ্গে মরমী একটি একটি করে ডগা ভাঙছে। এককালে সে ওইভাবে শিউলি ফুল তুলতো।

মরমী।

বল আকাশ।

এইভাবেই চলবে ?

মরমী মুখ তুলে চায়। একটু ভেবে নিয়ে বলে,—তবে কি ভাবে ?

নরেনবাবুর ওখানে সত্যিই আর যাবি না।

এতদিনেও বুঝিস নি ?

বুঝেছি বৈকি। কিন্তু তোদের এই অনিশ্চয়তা দেখে আমার ভাল লাগে না।

নিশ্চয়তা কিভাবে আসবে ভেবেছিস কিছু।

আমি না ভাবলেও কল্যাণীর দেখলাম স্পষ্ট ধারণা আছে। আসলে ও বাস্তবটা ভাল বোঝে। ঘটি না-ডোবা তালপুকুরের পাড়ে বসে ঘি-এর গন্ধের আশায় হাত শোঁকে না।

তার মানে ?

ওর মন্তব্য হলো, নরেনবাবুকে তোর ডিভোর্স করা উচিত।

বাঃ, বেশ পেকেছে দেখছি।

আর একটু বেশী পেকেছে। বলে, তোর আর একবার বিয়ে করা উচিত।

মরমী শাক তোলা ভুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। পরে বলে,—এই বলেছে কল্যাণী ?

তুই আকাশ থেকে পড়লি মনে হচ্ছে। ও ঠিকই বলেছে।

তুই-ও।

হ্যাঁ, আমিও। তাহলে নতুনভাবে জীবনটাকে আরম্ভ করতে

পারিস।

আকাশ একথা ভাবতে পারলি ?

তুই নরেনবাবুর ঘর করার কথা ভাবতে পারিস ?

না।

অর্থাৎ, নরেনবাবুকে তুই মনপ্রাণ সমর্পণ করিস নি।

থাক, ঢের হয়েছে। বুঝতে পারছি, এবারে কি বলবি। আমি আর শুনতে চাই না।

বাড়ির ওপরের তলায় অনন্তবিজয়ের ঘরের খড়খড়ি তোলার শব্দ হয়। একটু পরে জানলাটাও খুলে যায়। আকাশ দেখে তার মা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। তাকে আর মরমীকে মা লক্ষ্যই করল না। ওখান থেকে এই মাটির নীচের ঘরের কাছটা ভাল চোখে পড়ে না। তাছাড়া মা কিছুদিন ধরে অন্যমনস্ক। অসুস্থ শশুরের সেবা ঠিকই করে যাচ্ছে, কিন্তু কথা বলছে কম। অনেক সময় আকাশবিজয়ের ডাকেও সাড়া দেয় না।

কি হয়েছে তোমার মা ?

ভাল লাগছে না।

শরীর খারাপ ?

না।

তবে ? ডাক্তার দেখাবো।

না।

কথা বল না কেন ?

মা উত্তর দেয় না। এইভাবেই চলছে। অনন্তবিজয় মোটামুটি সুস্থ। প্রেসারও এমন কিছু বেশী নয়। এ বয়সে ওটুকু ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

মা আশেপাশে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে। তাকে নয় তো।

চল মরমী। তোর শাক তোলা হয়েছে।

হ্যাঁ।

আমাকে একটু রেঁধে দিস তো ? খাব।

সত্যি খাবি ?

খাব না কেন ? তুই আমাকে হঠাৎ যেন সত্যবিজয় বলে মনে করছিস।

মরমী মৃদু হেসে বলে,—দেবো। এর সঙ্গে একটু বেগুন কুচি কুচি করে দিলে আরও ভাল হয়। বেগুন নেই। না থাক, আমার তো ভালই লাগে।

আজকে দু'জনে মিলে একসঙ্গে ভাত খাবি ? সে-ই খেতাম, চপলাসুন্দরী বসে থাকতো—মনে আছে ?

মরমী হেসে বলে,—খুব মনে আছে।

তুই তোর ভাতের থালা নিয়ে আমাদের ঘরে আয়। আমিও যেতে পারি তোর ঘরে।

তুই আমাদের ঘরে আসিস।

খুব মজা হবে তাই না রে ?

হ্যাঁ, অনেকদিন পরে আজ আনন্দ পেলাম। সত্যি আকাশ, তুই এতো ভাল না।

এই রে, আমার শুনতে কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এর পরে আর আমাকে খারাপ বলিসনা লক্ষ্মীটি।

আচ্ছা, আকাশ শাক ছাড়া যে আর কিছু নেই।

আমি ডাল এনে দেব। ফুটিয়ে নিতে পারবি তো ?

জ্যেঠিমা রাগ করবে না তো,?

ভাল কথা বলেছিস। মা শুনলে হেঁসেলে যা আছে সব দিয়ে দেবে। আমি মাকে দিয়ে রাঁধাতে চাইনা। এমনিতে বা রাঁধবে সেটুকু নিয়ে আসব। দু'জনে ভাগ করে নেব। আমাদের তো মাছের বালাই নেই। তোর ঘরে লঙ্কা আছে তো ?

কেন ?

ডালের মধ্যে লঙ্কা না থাকলে ভাল লাগে না।

সে ব্যবস্থা করব। উঃ কি ভালই লাগছে।

আকাশের মনে হয় মরমীর গালে সেই আগের মত রক্তোচ্ছ্বাসের

আভাস যেন একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটু যত্ন পেলে মরমীকে দেখতে হতো সম্রাজ্ঞীর মত।

চলিরে। মা বোধহয় আমাকে খুঁজছে। মায়ের যদি একটা ভাই-ও থাকত, তোর মত আমারও তাহলে একটা মামা হতো। মামার অভাব মাঝে মাঝে অনুভব করি।

মামা না থাকাই ভাল।

আকাশের হঠাৎ সব মনে পড় যায়। নরেনের সম্বন্ধ মরমীর মামাই এনেছিল, সে চুপ করে যায়।

বৈঠকখানা ঘরে বসে আকাশ খবরের কাগজ পড়ছিল। বধূহত্যার বিবরণগুলো বাদ দিয়ে পড়ে সে। মরমীরও তো ওই অবস্থা হতো কদিন পরেই। সে হঠাৎ দেখতে পায় একজন লোক রাস্তা থেকে উঁকিঝুঁকি মারে। ভাবখানা ঢুকবে কি ঢুকবে না।

আকাশ তাকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে বলে—আপনি কাউকে খুঁজছেন ?

আমি লিলুয়া থেকে এসেছি।

আকাশের মুখ পাংশুটে হয়ে যায়। লিলুয়া ! মানে নরেনবাবুর বাড়ি—মরমীর স্বামীর ঘর।

আপনি কাকে চান ?

এটা কি নরেন গাঙ্গুলীর শ্বশুরবাড়ি ?

হ্যাঁ।

আপনি তার কে হন ?

সম্পর্কে শ্যালক বলতে পারেন।

মানে, খুব দুঃসংবাদ কিনা।

নরেনবাবুর কিছু হয়েছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্যই তো এসেছি।

কি হয়েছে ?

গত রাতে জি. টি. রোডে বাস এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ?

হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে।

দাঁড়ান খবরটা দিয়ে আসি।

আরে সবটা শুনুন আগে। বাসের চাকা মাথার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। বেঁচে নেই।

আকাশের মাথা ঘুরতে থাকে। মরমী বিধবা। এই রকম অবস্থার কথা সে কল্পনাও করেনি কখনো। অথচ কদিন আগে কল্যাণী যখন ডিভোর্সের কথা বলে মনে মনে সে সায় দিয়েছিল। এমন কি দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাবেও। সে জানে, মরমীর পক্ষে চপলা সুন্দরীর প্রভাবযুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই মরমী আর মাছ খাবে না। মরমী সিঁথিতে সিঁদুর দেবে না। চওড়া লাল পেড়ে শাড়িও সে আর পরতে চাইবে না বোধ হয়।

কিন্তু এই সংবাদ কী করে জানাবে তাকে, তার মাকে ? ওদিকে লোকটি অধৈর্য হয়ে উঠছে।

কি মশায় শক লাগলো নাকি ? আমি কি করব বলুন। খবরটা তো জানাতে হবে।

না না, ঠিক আছে। আপনি যান, আমি ব্যবস্থা করছি।

হাসপাতালে চলে যাবেন কিন্তু! ওঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। দেরী হলে আর দেখা হবে না। মড়া কাটার ঘরে চালান দিয়ে দেবে বলেছে। সেখান থেকে ইঁদুরে ঠোক্‌রানো পচা-গলা যে মাল ডেলিভারী দেবে, তা দেখলে ওর স্ত্রী হার্টফেল করবেন।

ঠিক আছে। আমি দেখছি।

মশায়ের নামটা কি ? জেনে নেওয়া দরকার।

আকাশবিজয় মুখোপাধ্যায়।

বাবা, বিরাট নাম। মনে থাকবে। আকাশ। বেশ নাম। আরে মাল তো মশায় আমিও টানি। অমন বেহুঁশ হয়ে পথ চলি না তাই বলে।

আপনি ওঁর সঙ্গে কাজ করতেন ?

হ্যাঁ। একই ইউনিয়নের। কি রকম স্ট্রং ইউনিয়ন দেখলেন তো? ঠিক খবরটা দিয়ে গেলাম।

লোকটি চলে গেলে আকাশ ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতরে যায়। এক সময় দেখতে পায় নিজের অজ্ঞাতে অনন্তবিজয়ের ঘরের দিকেই চলেছে সে। অভ্যাস। বাড়ির মাথা অনন্তবিজয়।

অনন্তবিজয় শুনে বলে ওঠে—সেই বাঁদরটা মরেছে তাহলে?

যা কখনো সম্ভব বলে মনে হয়নি আকাশের পক্ষে তেমনি একটা মন্তব্য হঠাৎ করে বসে সে—তোমার আশীর্বাদের জোর আছে দাদু। কোন্ বংশ দেখতে হবে তো?

কি? কি বললি?

না কিছু না।

শেষে তুইও?

তুমি তাকে তো আশীর্বাদ করনি। অভিশাপ দিয়েছিলে ঠিক কিনা বল?

জানি না যা।

শত হলেও মরমী বিধবা হলো দাদু।

তা হোক। সধবা থাকার যা ছিরি দেখলাম এতোদিন।

আকাশবিজয় আজ সব কিছুতেই অস্বাভাবিকতা দেখছে। মরমীকে গিয়ে বললে কী প্রতিক্রিয়া হবে বুঝতে পারে না। মরমীর বাবা না হয় পাগল। কিন্তু মা? অথচ তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। সে সুচিত্রা কাকীর ঘরের দিকে যায়। নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। দিগ্বিজয় আর কল্যাণীর সঙ্গে এইখানেই তার ধাতুগত পার্থক্য।

সুচিত্রা কাকী সব শুনে বলে—আগে মরমীকে বলাই ভাল।

তুমি বলবে?

মেয়ে হয়ে আর একজন মেয়েকে কী করে এই সর্বনাশের কথা শোনাই। তোর বলাই ভাল।

সেই সময় মরমী কিছু ভিজে কাপড়-চোপড় নিয়ে ছাদে উঠছিল

শুকোতে দেবার জন্যে। তাকে দেখে আকাশ ঘাবড়ে যায়। মরমী কেন যেন আজ কপালে যত্ন করে সিঁদুরের টিপ পরেছে—বেশ বড় করেই পরেছে। সুচিত্রা কাকী তাকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়।

এখানে কি করছিস রে আকাশ ?

খুব খারাপ খবর ছিল।

শকুন্তলা ?

শকুন্তলার আবার কি হলো ?

মরমীর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলে—না। সুচিত্রা কাকীর কাছে এসেছিস কিনা তাই। কাকী আমাকে দেখে যেভাবে সরে গেল মনে হলো শকুন্তলা বুঝি কিছু অকাজ করেছে।

খবরটা তোরই মরমী।

আমার ? ও বুঝি আমাকে নিতে আসছে। আমি যাব না। আমাকে তুই বাঁচা আকাশ।

না। মানে, আর কোনোদিনই নিতে আসবে না।

মরমীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল নাকি ? দেখতে ভুল হয়নি তো। মরমী বলে—সত্যি বলছিস ? আমাকে ত্যাগ করেছে ?

না। মানে, নরেনবাবু কোনোদিনই আর আসবেন না।

একই কথা।

তুই বুঝছিস না মরমী। খবরটা খারাপ। খুব খারাপ।

ও।

একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

হাসপাতালে ?

হ্যাঁ। তবে খুবই খারাপ এ্যাকসিডেন্ট।

মরমী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে একই ভাবে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—বুঝেছি।

তোকে যেতে হবে যে এখনি।

মরমীর মুখ কেমন কঠোর হয়ে ওঠে। তার শুকিয়ে যাওয়া মুখের ভাসা ভাসা শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে। একটু হাঁপায় সে।

তারপর কেমন ভাবে হেসে ওঠে।

বলে—কেন? যেতে হবে কেন? সহমরণে নিয়ে যেতে চাস্? আমি যাব না।

মরমী।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। চপলাসুন্দরীর কথা মনে রেখেই বলছি। সহমরণ অনেকদিন আগে উঠে গিয়েছে। রামমোহন উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। তোরা জোর খাটাতে আসিস না।

কথাগুলো মরমী বলেছিল বেশ উঁচু গলায়। এভাবে সে কখনো কথা বলে না। তাই তার কণ্ঠস্বর ভেঙে যাচ্ছিল। সুচিত্রা কাকী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বার হয়ে এসে মরমীকে চেপে ধরে বুকের মধ্যে। ভিজে কাপড সমেত মরমী বেহুঁশ হয়ে পড়ে।

তাকে সেখানেই শুইয়ে দিয়ে সুচিত্রা কাকী একটা তালপাতার পাখা এনে হাওয়া করতে করতে বলে—তুই ওর মাকে ডাক আকাশ।

ওকে যে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

আগে সুস্থ হোক।

মরমীর আর যাওয়া হয়নি। আকাশ আর অচ্যুত গিয়েছিল প্রথমে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে। দেখেছিল মৃত নরেন বাবুকে। তার পরদিন গিয়েছিল শিবপুর শ্মশানে। নরেনবাবুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হতে দেখেছিল। মুখাগ্নির জন্য আর একবার মরমীর কথা উঠেছিল। সে অসুস্থ বলে নরেনবাবুর সেই কম বয়সী সাক্ষাৎ কাকা ভোম্বল. সে-ই বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে আসে।

শালা, আমাকে সব দিক দিয়ে ফাঁসিয়ে গেল। এখন আমাকে আবার শ্রাদ্ধেও বসতে হবে নাকি? আমি পারব না বলে দিচ্ছি আগে ভাগে।

ইউনিয়নের মাতব্বর গোছের বলিষ্ঠ একজন এগিয়ে এসে ভোম্বলের কাঁধে চাপ দিয়ে বলে—তাড়াতাড়ি মুখে আগুনটা দিয়ে দিন তো। দশ দিন কাঁচকলা সেদ্ধ খাওয়ার কথা পরে ভাবা যাবে।

ততদিনে বউদি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি শ্রাদ্ধ করতেও রাজী। তবে ওর অফিসের ফাণ্ড-টাণ্ডে যা কিছু আছে আমাকে দিতে হবে সব।

ও বাব্বা। ব্যাটা সেয়ানা দেখছি। ঠিক আছে। মুখাগ্নিটা হোক।

আমার নাম ভোম্বল। বিখ্যাত বটকেষ্ট গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশধর, আমার এক কথা। মালকড়ি না ছাড়লে শ্রাদ্ধ হবে না বলে দিচ্ছি। ভূত হয়ে ও সবার ঘাড় মটকাকে। তখন আমাকে দোষ দিও না। নরেনের আত্মা বেঁচে থাকতেই অতৃপ্ত ছিল। এখন ডবল অতৃপ্ত।

কয়েকজন উসখুস করে। একজন আকাশবিজয়ের দিকে এগিয়ে এসে বলে—শুনলেন। আপনার বোন ছাদ্দ-ফাদ্দ করবেন তো?

আকাশ একবার অচ্যুতের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে—করবে।

ব্যস, এবারে আগুনটা ঠেকিয়ে দিন তো ভোম্বল বাবু।

সেদিন বাড়ি ফিরে আকাশ লক্ষ্য করেছিল মরমীর সিঁথির সিঁদুর ঘষে ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। তবে তার হাতে দুগাছা রূপোর চুড়ি আছে। শাড়িরও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। ওর সোনার হার, চুড়ি বিয়ের পরপরই নরেনবাবু কেড়ে নিয়েছিল।

তবু আশ্বিন এলো এবং ,বাড়ির শিউলি গাছে দুচারটে করে ফুল ফুটতে শুরু করল। নিয়মিত ঝরেও পড়তে লাগল নিচে। ছেলেবেলায় মরমী তার টুকটুকে ফর্সা হতে ওই ফুল তুলত। বলত, এই গাছটা কিন্তু আমার আকাশ। চাঁপা গাছটা তোর। ওদের দুজনার মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল।

কলকাতার চেহারা দ্রুত পালটে যাচ্ছে। তার আকাশের রূপরেখা ভাবী নিউইউর্ক হবার দুরূহ প্রত্যাশা বুকে নিয়ে দিন গুনছে। যদি দিন এইভাবে চলে, যদি ওপর থেকে গঙ্গার জল ক্রমাগত টেনে নেবার ফলে কলকাতা বন্দর ছাতি ফেটে একদিন মারা না যায়,

তাহলে এই আশা কোন দিন বাস্তবায়িত হতে পারে। তবু আগের সেই কলকাতা, ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতা, মাইকেলের কলকাতা, জেলে-পাড়ার সঙ-এর কলকাতা এখনো আনাচে-কানাচে অনেকের অগোচরে একটু আধটু আটকে রয়েছে। সবটুকু এখনো মুছে নিতে পারেনি অপসংস্কৃতির বুলডোজার—যা পার্ক নষ্ট করে, ময়দান নষ্ট করে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য নষ্ট করে। প্রকৃত স্বাধীনতার বলিষ্ঠ প্রগতির সেই যাদুস্পর্শ কলকাতা মহানগরী বিশেষ পায়নি। পেতে পেতে হারিয়ে ফেলল সেই স্পর্শ যা পুরাতনের অবলুপ্তি ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন সব নতুনের সৃষ্টি করতে পারে যা দৃষ্টিনান্দনিক—যাকে নিয়ে গর্ব করা যায়। অথচ ঐতিহ্যপূর্ণ পুরোনো জিনিষগুলোকে ক্ষমতা আর শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করে।

আকাশ এত সব না ভাবলেও এ-বাড়ির ওপর সত্যিই তার এখনো মায়া আছে। সে ভাবতে পারে না এমন একটা বাড়িতে থাকতে হবে যেখানে শিউলি ঝরে না, চাঁপা ফুল ফোটে না। যেখানে টুনটুনি বাসা বাঁধে না। যেখানে সরস্বতী পুজোর সময় নারকেল কুল গাছে কুল হবে না।

তবু আকাশ অনেকটা বাস্তববাদী। সে অনন্তবিজয় নয়। অনন্ত-বিজয়ের নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার কোনো ক্ষমতাই নেই। না খেয়ে মরবে তবু ভাল, বাড়ি বিক্রি করবে না। আকাশ এবং এ-বাড়ির আর কেউ তেমন না। অস্তিত্বকে বজায় রাখতে চায় তারা। গ্যাংগ্রীনে আক্রান্ত দেহাংশকে বাদ না দিলে বেঁচে থাকা যায় না এ জ্ঞান তাদের আছে। তাই চপলাসুন্দরীর একমাত্র প্রতিভূ হয়েও মরমী স্বামীর মৃতমুখ পর্যন্ত দেখতে গেল না। সে বদলে গিয়েছে। বাস্তবকে বুঝতে শিখেছে।

আজ সকালে মরমীকে শিউলি তলায় ফুল কুড়োতে দেখে সেই ছেলেবেলার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আকাশের। সত্যিই সকালের প্রথম সূর্যের আলো মরমীর শঙ্খ-বিনিন্দিত হাতকে রক্তিম করে তুলত। এত স্বচ্ছ ছিল তার ত্বক, সূর্য যেন সেই ত্বক ভেদ করে

অন্যদিকে ফুটে বার হতো রক্তজবার মতো। আজও সেই মরমীই ফুল তুলছে। কত তফাৎ।

কি করছিস রে আকাশ?

টুনটুনি।

ও।

আগের দিন হলে মরমী অল্পেতে থামত না। অনর্গল কথা বলে যেত। এখন সে বেশি কথা বলে না। সে জীবনটাকে দেখে নিয়েছে। আর আকাশবিজয়ের কিছুই দেখা হয়নি। তার মনে প্রচ্ছন্ন আশা রয়েছে, অসম্ভব কিছু একটা ঘটে গিয়ে তার জীবনের মোড় ঘুরে যাবে। অচ্যুত একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তুই কোনোদিন বড় হবি না আকাশ। তোর মুখ থেকে তাই আজও কৈশোর চলে যায়নি। শুনে ভয় হয়েছিল আকাশের। সে শুনেছে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা চল্লিশোত্তরেও নিজেকে পরিণত বলে ভাবতে শেখে না। নিজের ওপর আস্থা তাদের কখনো হয় না। এই আস্থা ভাবটা বয়সের ওপর নির্ভরযোগ্য নয়। বাড়িতেই সে দেখছে কল্যাণীকে। অতটুকু মেয়ে অথচ কী ব্যক্তিত্ব। কচি মুখেও কত গাম্ভীর্য।

ফুল কি করবি রে মরমী? মালা গাঁথবি!

মালা? কার জন্যে?

আগেও তো মালা গাঁথতিস।

আগে? সেই আগে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তখন গাঁথতাম বিনা কারণে। আজ বৃহস্পতিবার।

ও।

আজকাল মরমীর সঙ্গে বেশি কথা বলা যায় না। অনেক ভেবেচিন্তে বলতে হয়।

সেই সময় আকাশের নজরে পড়ে দোতালার জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার মা তাকে ডাকছে। অবাক হয় সে। মা কখনো এভাবে ডাকে না। দিনে কথাই বলে দুবেলা খাওয়ার সময় দুচারটে। বাবা কবে মারা গিয়েছে তারপর থেকেই মা এমন। মা যখন আমুদে ছিল

তখনকার কথা আকাশের মনে নেই। খুব নাকি হৈ চৈ করত।

মায়ের হাতছানিতে আকুলতা। সে দ্রুত ওপরে উঠে গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়ায়।

আকাশ আমাকে নিয়ে চল।

কোথায়?

তা জানি না! তুই এ-বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যা।

মা, তুমি এ কথা বলছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

মায়ের মুখের দিকে ভালভাবে চেয়ে দেখেনি সে কখনো। প্রয়োজন হয়নি। আজ নজর দিলে দেখে সেই মুখ পাংশুবর্ণ। বাড়ির বউদের মধ্যে সেরা সুন্দরী ছিল মা। আজ সে দেখে, মায়ের মধ্যে প্রৌঢ়ত্ব জেঁকে বসেছে। তাছাড়া আতঙ্কে সেই মুখ থরথর করে কাঁপছে।

তুমি ভয় পেয়েছ মা?

হ্যাঁ।

কিসের ভয়?

একটা অদ্ভুত ছায়া সব সময় ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিন থেকেই দেখছি। বিপদ ঘটবে এ-বংশের। তুই দেখে নিস। ভাল হবে না কারও। তুই তাড়াতাড়ি এ-বাড়ি ছেড়ে দে।

তোমার শরীর খারাপ হয়েছে মা।

না না, এই মুহূর্তে ইন্দ্রবিজয় এসেছিল।

আকাশ ভ্রূ কুঁচকে একটু চেঁচিয়ে ওঠে—কে?

ইন্দ্রবিজয়। চিনিস না? তিনি বললেন, আকাশকে নিয়ে পালিয়ে যাও। পাপ এ-বাড়িকে একেবারে পচিয়ে দিয়েছে। ভেঙে পড়বে শীগগির। তুই পালা আকাশ।

মৃত ইন্দ্রবিজয়কে দেখতে পেয়েছে মা? শুনেছে বটে ইন্দ্রবিজয়ের আত্মা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চপলাসুন্দরীও বলত সে কথা। কিন্তু সে অনেকটা গল্পের মতো। কেউ কখনো স্বচক্ষে দেখেছে বলে প্রমাণ নেই। মায়ের অসীম ধৈর্য, অগাধ সহিষ্ণুতা। সেই মা এমন অধৈর্য

হয়ে উঠল ? কেন ? এতদিনের অপরিসীম মানসিক কষ্ট চেপে রেখে রেখে মায়ের কি অবশেষে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। বাবার মৃত্যুর পরে মা কখনো এ-বাড়ি ছেড়ে যায়নি। তার মামা বলতে কেউ নেই। মা-ই একমাত্র সন্তান। তার মা-বাবা মৃত। যাওয়ার জায়গাও নেই কোথাও।

একটু ভয় পায় আকাশ। তেমন কিছু ঘটলে সে কি করবে ?

চুপ করে আছিস কেন ?

না। কিন্তু দাদু যে যেতে চাইবেন না।

না চাইলে চাপা পড়ে মরুক। আমি কি করব ?

চমকে ওঠে আকাশ। দাদুর সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কখনো কোনো কথা মা বলে না।

চুপ করে রইলি কেন ? কথার জবাব দে।

হ্যাঁ মা নিশ্চয় নিয়ে যাব। আমার একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে খবর পেয়েছি। সেটা হলেই নিয়ে যাব। তুমি কটা দিন সবুর কর। আমি বরং অচ্যুতকে বলছি একটা ভাড়া বাড়ির খোঁজ করতে।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আর্তনাদ বার হয়ে আসে মায়ের মুখ দিয়ে, হতাশ হয়েই যেন বলে—তাই দেখ। দেরী করলে বাঁচবি না; এক এক করে এ-বাড়ির সবাই মরবে। অশুভ ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে; ইন্দ্রবিজয় তাদের কত তাড়াবে।' ওই—ওই যে।

মা ছুটতে ছুটতে অন্য ঘরে চলে যায়।

এখন কি করবে আকাশ ! তার মনে হয়, মুখে যতই কৈশোরত্বের প্রলেপ মাখানো থাকুক না কেন সে সাবালক। একটা গোটা সংসারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে, সেই সঙ্গে আংশিক ভাবে মরমীদের সংসার। তবু আজ মায়ের অবস্থা দেখে সে অনুভব করে, আগেকার কোনো সমস্যাই তাকে এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। কোনো সমস্যাকেই সে এভাবে নিজের বলে ভাবতে পারেনি।

অনন্তবিজয়কে গিয়ে বলবে নাকি ? না, এখন থাক। তার চেয়ে বরং আজ ভরতপুরে বাগানের সেই পাতালগৃহে গিয়ে বসবে যেখানে ইন্দ্রবিজয় মদ খেতে খেতে মরেছিল। দেখতে হবে সত্যিই লোকটা তার মুখোমুখি হয় কি না। যদি হয়, বলতে হবে, পাপ তোমরাই করেছ। যাদের নিঃস্ব করে রেখে গিয়েছ তাদের পাপ করার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। তবু তোমাদের অনাচার ব্যভিচারের ফলভোগ করে চলেছে তারা। যার জন্যে বাড়িতে একজন পাগল, আর একজনেরও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে চলেছে। একজন সোনার প্রতিমা অঙ্গে মশি ঢেলে বৈধব্য বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে পেত্নীর মতো—সেও তোমাদেরই পাপে। তোমাদের লালসাই হয়ত জড়বুদ্ধি করে ফেলেছে কিছু বংশধরকে। তবে কেন আরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে অপঘাতে মৃত্যু বরণ করে ?

প্রশান্তবিজয়ের ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস আছে। রাত জেগে যাত্রা করে করে রাতে তার আর ঘুম হয় না। তাই বাড়িতে থাকলে দিনে জোলাপ নিতে হয় আর রাতে ঘুমের বড়ি। আকাশবিজয় দুপুরে খাওয়া সেরে সুচিত্রা কাকীর কাছে যায়।

আকাশ জানে আজ প্রশান্তর দাঁতনে যাত্রা রয়েছে। সে বাড়ি নেই। তবু জিজ্ঞাসা করে—কাকা কোথায় ?

আজ সে দাঁতনে 'মরিয়ম বেগমে'র নায়ক।

আর শকুন্তলা ?

একটু আগেও তো ছিল। বোধহয় কল্যাণীদের ঘরে আছে।

শকুন্তলা পড়াশোনা করছে তো ?

কী জানি। বইপত্তর তো মাঝে মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখি। উৎসাহ বড় একটা নজরে পড়ে না। সব সময় বিবি সেজে থাকে। আর আয়নায় বারবার মুখ দেখে।

দেয়ালে চমৎকার একটা চামড়ার ব্যাগ ঝুলছিল। মেয়েরা এই ধরনের ব্যাগ নিয়ে ইস্কুল কলেজে যায় আজকাল। বেশ দামী।

বাঃ, ভাল ব্যাগ দেখছি।

শকুন্তলার কোনো বন্ধু প্রেজেণ্ট করেছে।

বন্ধুভাগ্য ভাল বলতে হবে।

হ্যাঁ, তোর যেমন অচ্যুত।

আকাশ মিইয়ে যায় কথাটা শুনে। তবে ছোটবেলা থেকে অচ্যুত সম্বন্ধে শুনে গা-সহা হয়ে গিয়েছে। সে বলে—কাকার কয়েকটা ঘুমের ট্যাবলেট দেবে আমাকে?

কে খাবে?

মায়ের বোধহয় রাতে ভাল ঘুম হয় না। আজকে একটু দিয়ে দেখব।

কি করে বুঝলি ঘুম হয় না?

যেদিন আমার ঘুম হয় না, মাকে দেখি ছটফট করছে কিংবা বিছানার ওপর বসে আছে। আগে অতটা গুরুত্ব দিইনি। আজ মনে হচ্ছে মায়ের ঘুমোনো দরকার।

সুচিত্রা কাকী দেরাজ থেকে দুটো ট্যাবলেট বার করে দেয়। আকাশ নিয়ে ঘরে ফেরে। রাতে খাইয়ে দিতে হবে। ভাল ঘুম হলে নীতিন ডাক্তারকে সব বলে আরও ওষুধের ব্যবস্থা করতে হবে। মা কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চাইবে না সে জানে। সে শুনেছে দীর্ঘদিনের অনিদ্রার ফলে মানুষ বিভীষিকা দেখে। মায়ের ভেতরে তো জ্বালা রয়েচে যথেষ্ট। বহিঃপ্রকাশ নেই। তারই ফলে বোধহয় এমন হয়েছে। নীতিন ডাক্তার শুনলেই বুঝতে পারবে।

মায়েরও যে শরীর আছে এবং মন বলে পদার্থ আছে এতদিন সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না আকাশের। সে দেখেছে মা নীরব থেকে ঠিকমতো কাজ করে যায়, দাদুর পরিচর্যা করে, তাকে খাবার সময় খেতে দেয়। আজ মায়ের চাপা যন্ত্রণার এই প্রকাশ বিরাট ছন্দপতন ঘটায়। তাই নিজে দুপুরে খেয়ে নিয়ে মায়ের জন্যে অপেক্ষা করে।

মাকে কেমন উন্মনা দেখে। স্নান-টান না করে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তুমি চান করবে না মা ?

হ্যাঁ করব।

করে এসো।

কেন ?

যাও না, চান করে এসে খেয়ে নাও।

আমার খেতে ইচ্ছে করে না।

না করলেও খেতে হয়। নইলে শরীর ঠিক থাকে না।

মা সত্যিই বেশি কিছু খেতে পারল না। নাড়াচাড়া করে পাতে জল ঢেলে উঠে পড়ল। কবে থেকে এমন করছে কে জানে। নীতিন ডাক্তারকে বলতেই হবে।

তুমি শুয়ে পড় মা। বিশ্রাম করে নাও।

আমার ঘুম আসে না। ইন্দ্রবিজয় ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

সেই ইন্দ্রবিজয়ের মোকাবিলা আমি আজ করব।

আতঙ্কিত হয়ে মা বলে—তুই ? কি করবি ? না না, তোকে কিছু করতে হবে না।

ভয় নেই মা। তুমি শুয়ে পড়। রাতে যাতে তোমার ঘুম হয় আমি দেখব।

মা তার কথা শুনে ছোট্ট মেয়ের মতো শুয়ে পড়ে। দেখে তার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু শুয়ে মা ছটফট করে। এ-বাড়ির চিরকালের নিয়ম দুপুর দুটো থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত মেয়েরা শুয়ে থাকে —বিশ্রাম করে। পেটে ভাতের যোগান অনেক ঘরে ঠিকমতো না হলেও, নিয়মটা এখনো রয়েছে। সেই সময় বাড়িটা স্তব্ধ থাকে।

আকাশবিজয় ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে বাগানের ভেতরে যায়। মাটির নিচের ইন্দ্রবিজয়ের ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। দেখা যাক, লোকটার প্রেতাত্মা ভরদুপুরে সত্যিই তার সামনে আসে কিনা। দিগ্বিজয়ের সেই বাঘা যতীনের ধরনের যুদ্ধের পরে এদিকটা কেউ বড় একটা মাড়ায় না। তবু একটা আবছা সরু রাস্তাকে চলে যেতে দেখে আকাশ বুনো আগাছা আর ঘাসের ভেতর দিয়ে। কিছুদিন আগে

অবধি পৃথ্বীবিজয়ের বিধবা বোনের ছেলে ঘোটন এ-বাড়িতে ছিল। বছরের অনেকটা সময় হুগলীর গ্রামের বাড়ি ছেড়ে এখানে কাটিয়ে যায় তারা। আর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তো থাকবেই। ঘুড়ি ওড়ানোর বেজায় শখ ঘোটনের। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ছাদে তার একচ্ছত্র অধিকার। তবে ঘুড়ির মাঞ্জা দেওয়ার আর ঘুড়ির গুদামঘর হলো ওই মাটির নিচের কোঠাঘরটি। ভূত প্রেতের ব্যাপারটা গ্রামের ছেলে বলেই বোধহয় সে আমল দেয় না কিংবা শোনেনি। সবে আশ্বিন মাস পড়েছে। কিছুদিন আগে বিদায় নিয়েছে ঘোটন। তবে তার আগমন নির্গমনের পথটি সম্ভবত এখনো মুছে যায়নি।

আকাশবিজয় ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। দিগ্বিজয়, তার অস্ত্রাগারের দিকে যাতে আকাশ না যায়, সেজন্যে ভূত আর সাপের একটা আলতো ভয় দেখিয়ে রেখেছিল। এ-বাড়ির ছেলে বলেই বোধহয় সেই ভয় এখনো ক্রিয়া করে আকাশের মনের মধ্যে। তাই ঘাসের মধ্যে দিয়ে যেতে আজও তার গা শিরশির করতে থাকে। তবু সে এগোয় এবং ঘরটিতে নামার প্রথম সিঁড়িতে পা দেয়।

নিচে কিসের শব্দ হচ্ছে যেন? টুংটাং? কেউ আছে। মদের গ্লাসের শব্দ না চুড়ির শব্দ? ইন্দ্রবিজয়ের কাছে বাঈজীরাও আসত নাকি? আকাশবিজয় থমকে যায় কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু সে তো ইন্দ্রবিজয়ের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে। ভয় পেয়ে থেমে পড়লে চলবে কেন? আরও দু-ধাপ নিচে নামে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পষ্ট শব্দ। উত্তেজিত ফোঁস ফোঁস শব্দ। সত্যিই মানুষ নাকি? আকাশ দ্রুত ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

একি! অচ্যুত আর শকুন্তলা। আলুথালু। অচ্যুত ছিটকে উঠে দাঁড়ায়। শকুন্তলা একপাশে সরে গিয়ে মুখ নিচু করে দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

আকাশ বোবা। কী বলবে, কী করবে ভেবে পায় না। তার বন্ধু অচ্যুত আর মুখোপাধ্যায় বংশের সম্পর্কে তার সাক্ষাৎ বোন শকুন্তলা।

আকাশ ওদের দিকে চেয়েই থাকে। সুচিত্রা কাকী বলেছিল, তার যেমন অচ্যুত, শকুন্তলারও তেমনি কোন বন্ধু রয়েছে যে তাকে ব্যাগ উপহার দিয়েছে। উৎসমুখ মনে হচ্ছে একই। অচ্যুৎ আর ওই সেদিনের ছোট্ট শকুন্তলা।

অচ্যুত আমতা আমতা করে বলে—আমাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গিয়েছে আকাশ।

রেজিস্ট্রি ম্যারেজ ? ও।

শকুন্তলা এগিয়ে এসে উবু হয়ে বসে আকাশের পায়ে মাথা ঠেকায়। আর অদ্ভুত ব্যাপার, অচ্যুতও তাই করে।

আকাশের মাথায় কিছুই ঢুকতে চায় না। এখন বন্ধু হিসাবে বড় ভাই হিসাবে তার ভূমিকা কি হওয়া উচিত ? সে কি শকুন্তলাকে গালাগালি দেবে না অচ্যুতের সঙ্গে বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাবে ? কোনো-টাতেই মন থেকে সাড়া পায় না। তবে কি দুজনার মাথায় দু'হাত হাত রেখে চপলাসুন্দরীর ঢং-এ আশীর্বাদ করবে ? সেই ডান হাতখানা ঢেউ খেলিয়ে ঢেউ খেলিয়ে তিনি যেমন মাথায় ধান-দুর্বো দিতেন ?

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। ওরা তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশ বুঝতে পারে এখন তাকেই একটা কিছু করতে হবে।

সে বলে—তোরা বিয়ে করেছিস যখন, তখন পাপীর মতো ব্যবহার কেন ?

শকুন্তলা কেঁদে ফেলে বলে—মা যে সহ্য করতে পারবে না।

সেটা আগে ভাবলে ভাল করতিস। এখন এভাবে মায়ের চোখে কতদিন ধুলো দিতে পারবি !

অচ্যুত আকাশের হাত দুটো ধরে বলে—তুই একটা ব্যবস্থা করে দে।

কি ব্যবস্থা করতে বলছিস ? সুচিত্রা কাকী সাংঘাতিক গোঁড়া। আমার দাদুর চেয়েও। বংশ নিয়ে তাঁর বিরাট গর্ব। মুখে তাঁর সামনে এ কথা উচ্চারণ করা অসম্ভব। আমি অতটা বলিষ্ঠ নই।

শকুন্তলা বলে—কি করব তবে ?

তুই সিঁদুর পরিস দেখছি।

হ্যাঁ, ঢেকে রাখি চুল দিয়ে।

দেখিস, তাঁর চোখে না পড়ে যায়। সর্বনাশ ঘটে যাবে।

জানি।

এখন চল এখান থেকে। মাথায় কিছুই ঢুকছে না। পরে যদি কোনো পথ খুঁজে পাই জানাবো তোদের।

অচ্যুত আকাশের সামনে কিছুতেই সহজ হতে পারে না। কোনো-রকমে বলে—আমি কি করব রে আকাশ?

তোর বাবা মা জানেন?

না।

তাঁদের অন্তত বলে রাখ। তাঁরা শুনে নিশ্চয় খুশি হবেন। এ-বাড়ির সঙ্গে তাঁদের অনেক দিনের সম্পর্ক।

বাবাকে জানিস না আকাশ। এ-বাড়ির প্রতিটি মানুষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। এ কথা শুনলে ক্ষেপে উঠবে।

তবু তোকেই আগে বলতে হবে। যতই হোক সেটা অনেক সহজ। তাছাড়া তুই ছেলে। শকুন্তলার পক্ষে কাজটা অনেক কঠিন।

অচ্যুত চলে যায়। শকুন্তলাও নিজের ঘরের দিকে যায়। আকাশ বৈঠকখানায় গিয়ে হাতল ভাঙা চেয়ারে বসে পড়ে। কী করা উচিত তার এখন? এতদিন কিছু জানত না, ভালই ছিল। এখন জেনে ফেলে তার ভেতরের বিবেক বারবার ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

প্রথমে মনে পড়ে কল্যাণীর কথা। বলতে গেলে এ-যুগের প্রতীক এই কল্যাণী। তাকেই সব জানানো দরকার। সে কীভাবে জিনিসটাকে নেয় দেখতে হবে।

ওপরে উঠে গিয়ে কল্যাণীকে ডাকে সে।

আমার সঙ্গে একটু বৈঠকখানায় যাবি? কথা আছে।

বাবা, এত কথা? ওখানে গিয়ে বলতে হবে? বেশ চল।

বৈঠকখানায় এসে আকাশবিজয় প্রশ্ন করে—শকুন্তলার ব্যাপারটা কিরে?

তুমি সত্যিই জান না ?

জানতাম না। একটু আগে জানলাম।

তাহলে আমাকে ডাকলে কেন ?

শোন। সব সময় চটে থাকিস কেন ? তুই কতদিন থেকে জানিস ?

বহুদিন থেকে। শকুন্তলাদিকে বলেছি রেজিস্ট্রি-ফেজিস্ট্রি করে নিতে। তারপরে পাতাল প্রবেশ করতে বলেছি।

পাতাল প্রবেশ মানে ?

জানি না। বল, আর কি জিজ্ঞাসা করবে ?

এই মাত্র শুনলাম ওরা রেজিস্ট্রি করেছে।

করেছে ? ভালই করেছে। তবে আর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

আকাশবিজয় বুঝতে পারে অচ্যুত আর শকুন্তলা যে মাটির নিচের ঘরে যেত এ খবরও কল্যাণী রাখে। তবু কত নির্বিকার।

সে বলে—আমি ভাবছি, ওর মা ওর বাবার কি হবে।

তাদের কথা ভেবে কি হবে ? নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। যা খুশি করবে।

কিন্তু তারা সামলাতে পারবে তো ?

পারে পারুক, না পারে না পারুক। এসে যায় না কিছু।

স্তম্ভিত আকাশবিজয় কল্যাণীকে তরতর করে চলে যেতে দেখে। সেই সময় মরমীকে নিচে দেখতে পেয়ে আকাশ ডাকে।

কাছে এসে মরমী বলে—একা একা বসে কি করছিস ?

ভাবছি শকুন্তলা কেমন বদলে যাচ্ছে।

সে তো অনেকদিন থেকেই। জীবনে নতুন রঙ লেগেছে।

তুই জানিস ?

ওই অচ্যুতের সঙ্গে মেলামেশার কথা তো ? জানি। ভাবছি বিপদ না ঘটায়।

শুনলাম রেজিষ্ট্রি ম্যারেজও হয়ে গিয়েছে।

ও। তবু ভাল।

একে তুই ভাল বলিস ?

না, আমি ভাবছিলাম শকুন্তলার বিপদের কথা। একদিকে রক্ষে।

কিসের বিপদ ?

মেয়েদের আবার কিসের বিপদ ?

কিন্তু অচ্যুত তো ব্রাহ্মণ নয়।

মরমী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অস্পষ্ট হেসে বলে—জানি। পরিবারের একটা কলঙ্ক রটবে। সহ্য করা বড়ই কঠিন। অনন্তবিজয় সহ্য করতে পারবে না। ওর মা যে কি করবে ভাবতে পারি না।

কোনো পথ আছে রে মরমী ?

আর কি পথ ? ওরা যেভাবে মিশেছে দেখছি তো। তুই ওদের বুঝিয়ে কিছু করতে পারবি না !

চপলাসুন্দরী হলে কি করত ?

সে যুগ পার হয়ে গিয়েছে। চপলাসুন্দরী অনেক ভুলও করেছে।

তাহলে ?

বোধহয় মেনে নিতে হবে। বড় কঠিন, তাই না ?

হ্যাঁ। তোর নিজের মত কি ?

আমার এখন আর কোনো মতই নেই। তুই-ই বল, আমার মতো মেয়ের মতের কোনো মূল্য আছে ?

আমার কাছে আছে।

তবে শোন, আমি ভাবি আমার মতো শকুন্তলাকে অন্তত সেই ভীষণ বিভীষিকা আর যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে না। সে কতটা কলঙ্ক লেপন করল তার চাইতে ওর ব্যক্তিগত দিকটাই আমি ভাবছি। মেয়েটা যদি সত্যিই সুখী হতে পারে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

তুই নিজে হলে এমন করতে পারতিস ?

না। ওভাবে আমি তৈরি হয়নি। এরা এই বংশের ফাঁকা আওয়াজ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। খেতে পায় না, পরতে পায় না—অথচ বড় বড় কথা। ফাঁকা কথায় আমরা ভুলে ছিলাম। এরা আরও পরের। তাই এদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা

দিয়েছে। আমরা কিছুই করতে পারব না। বড় বড় আদর্শের কথা তখনি মানায় যখন খাওয়া পরার ভাল রকম সংস্থান থাকে।

তুই এত ভাবিস?

এখন ভাবনা ছাড়া আমার আর কি অবশিষ্ট আছে? মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে একটা প্রলোভনের মধ্যে রাখলে ভালরকম কাজ হয়। আমার প্রলোভন ছিল চপলাসুন্দরীর ফাঁকা বুলি। এদের তাতে চলে না। এরা যদি জানত, এদের মা বিয়ের জন্যে পঞ্চাশ ভরি গহনা আলাদা করে রেখে দিয়েছে তাহলে পোষ মেনে থাকত মেয়েদের ভুলিয়ে রাখা অনেক সহজ। ছেলেদের মতো তাদের মাথায় আদর্শ ঢুকিয়ে দিলে সব সময় কাজ হয় না। এরা অনেক বাস্তববাদী। ধরা-ছোঁয়া যায় এমন কিছু টোপ হিসাবে এদের সামনে রাখতে হয়।

কিন্তু বংশেরও তো একটা মর্যাদা আছে।

আছে হয়ত। এই বংশের মানুষ যাত্রা করলে, সিনেমা করলে, চামড়ার ব্যবসা করলে যদি সয়ে যায়, এও সয়ে যাবে।

একটা কোনো কিছু পেশা অবলম্বন আর এ জিনিস কি এক হলো?

মরমী অদ্ভুত হেসে বলে—এখন দেখছি তুই-ই চপলাসুন্দরীর যোগ্য উত্তরসূরী।

সুচিত্রা কাকীর জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে রে।

কষ্ট তো আমার জন্যেও তোর হয়েছিল বলে মনে হয়। কিছু করতে পারলি?

আকাশ চুপ করে যায়।

ইনটারভিউ-এ তার নাম ডাকতে ডাকতে বিকেল সাড়ে চারটে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে আরও বিশ মিনিট। অফিস থেকে বার হয়ে লিফ্‌টের কাছে গিয়ে আকাশ দেখে সেটি অচল। লোডসেডিং। তবু ভাল, ওপরে ওঠার সময় এ-সব ঝামেলায় পড়তে হয়নি। দশ তলা থেকে নীচে নামতে তেমন অসুবিধা হবে না। সবাই নামছে।

জেনারেল নলেজ থেকে শুরু করে অনেক কিছু নিয়ে আকাশের ঘাঁটাঘাঁটি করার অভ্যাস আছে। শুধু তার নয় ভারতীয় যুবশক্তির কাছে এটাই শক্তি প্রয়োগের প্রাথমিক স্যাণ্ড ব্যাগ। এই স্যাণ্ড ব্যাগে হাত পাকিয়ে সেলেকসান্ বোর্ডকে নক-আউট করা নৈতিকভাবে কতজনের পক্ষে সম্ভব আকাশবিজয় জানে না। তবু সে সবার মত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সামান্য সংখ্যক অতি মেধাবী কিংবা অতি কর্মতৎপর শ্রেণীভুক্ত সে নয়। কলকাতার গিজগিজে রাস্তা থেকে এক খাবলা মানুষ তুলে নিয়ে ল্যাবরেটারিতে তাদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে গড় যে ফলাফল হবে আকাশের মস্তিষ্কের আই. কিউ. ইত্যাদি তার চেয়ে একবিন্দু বেশী হবে না, এ বিষয়ে সে সচেতন। তাই কোন রকম অভিমান বা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে সে কারও সম্বন্ধে বাঁকা কিছু ভাবে না। আত্মীয় কিংবা পরিচিতজনদের মধ্যে নিজের মূল্য বাড়াবার চেষ্টাও করে না। তার ধাতে এ-সব কোনকালেই ছিল না। শুধু দু'একটা ক্ষেত্রে সে যখন দেখে কোন পরিচিত জন শুধুমাত্র সোর্সের মহিমায় বিশেষ কোন চাকরী পেয়ে গেল, তখন ভাবে মুখুজ্জে বংশ যদি এখনো একটু নড়েচড়ে বসত, যদি আত্মসম্মানের ধ্বজা একটু গুটিয়ে রেখে যদি দু'একজনকে বলত, তাহলে সাধারণ চাকরী তারও হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দরকার সেই। ওভাবে চাকরী নিতে তারও প্রবল অনীহা। তার চাইতে এই ভাল। ইন্টারভিউ দাও আর বাড়ি ফেরো। পরীক্ষায় বসো আর ফিরে যাও। এইভাবে অনেকের মত তারও বয়স অতিক্রান্ত হবে একদিন। তখন আর ছকে-বাঁধা চাকরী পাওয়া যাবে না। তখন কি করবে? অন্য সবাই কি করে সে জানে না। অনেকে মিলিয়ে যায় নিশ্চয়। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে। আকাশ বুঝতে পারেনা, চাকরী না পেলে সে কি করবে? অনেক গুলো টিউশানি? বোধহয় তাই।

উপন্যাস টুপন্যাস পড়া বিশেষ অভ্যাস নেই আকাশের। তবু একেবারে যে পড়েনি তাও নয়। বেকার যুবকের চরিত্রও দু'একটা পেয়েছে ওই সব বই-এ। ইনটারভিউ দিয়ে বার হয়ে এসে ফুচকা

খেতে কাউকে দেখেনি, কিংবা কোন সিনেমা হলেও ঢোকেনি তারা। কারণ তাহলে চরিত্রে অসঙ্গতি ধারা পড়বে। লেখকের বদনাম। বেকার ছেলে পয়সা পাবে কোথায়? তারা আগেকার কার্জন পার্কে এসে বসে পড়বে, খুব বেশী হলে পেট চোঁ চোঁ করলে ঝাল মুড়ি খাবে। আগেকার দিনের লেখকরা মফস্বল থেকে কলকাতায় নায়ককে টেনে এনে স্রেফ খালি পেটে কলের জল খাওয়াতেন যত পারেন। তবু সেই নায়ক বেঁচে থাকত। অনেক সময় দুঃসাহসিক কাজ করে হঠাৎ ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলত। ঘোড়ার গাড়ি ছিল কলকাতায় অনেক। ঘোড়ার লাগাম ধরে নায়ক অনেক নায়িকাকে বিপদ থেকে মুক্ত করত।

আকাশ জানে উপন্যাসের নায়কের মত সে ওসব কিছুই করবে না। ঝাল মুড়ি খেয়ে পয়সা ফুরিয়ে ফেলে, ট্রাম বাসের বদলে হেঁটে যাওয়ার চেয়ে একটু বেশী পয়সাই অনন্তবিজয় তাকে দিয়ে দিয়েছে। তবু যে কিছু খেলোনা, কিংবা ট্রামে বাসেও উঠলো না। সে চলতে সুরু করল।

কলকাতাকে সে চিরকাল দেখে আসছে। আজকাল সরকারী আর বেসরকারী শুধু ডালহাউসী চত্বরে সীমাবদ্ধ নয়। একদিকে সল্টলেক, অন্যদিকে আলিপুর, তাছাড়া সহরের সব জায়গাতে ছিটিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অফিসগুলো। এমনিতে আকাশবিজয় বাড়ি থেকে বড় একটা বার হয় না। হলেও পাড়ার মধ্যে, কিংবা অচ্যুতের সঙ্গে মাঝে মধ্যে বেপাড়ায় যায়। আর ঘোরাঘুরি করতে হয়, চাকরীর খোঁজে। কলকাতাকে আজকাল তার বড় অচেনা বলে মনে হয়। সুতানুটি, গোবিন্দপুরের সময় থেকেই তারা এখানকার বাসিন্দা। তবু মনে হয়, এই সহরে সে যেন এক আগন্তুক। যারা মাথায় হেলমেট চাপিয়ে স্কুটার কিংবা মটর সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। যারা নতুন মডেলের দিশি বিদেশী গাড়ির পেছনের কোনে বিশেষ এক আলস্যযুক্ত ভঙ্গিমায় নিরাসক্ত ভাবে বসে রয়েছে, তারা নারী পুরুষ যে-ই হোক আর যে বয়সেরই হোক, তারাই শহরের প্রকৃত নাগরিক।

তাদের কথা সে বুঝবে না জানে। তাদের মধ্যে কেউ বাঙালী হলেও সে বুঝবে না। কারণ এটা বাঙালী অবাঙালীর ব্যাপার মোটেই নয়, এটা যে কী—স্পষ্ট ভাবে ধারণা নেই আকাশের। তবে আগে সংস্কৃতি বলে যে কথা চালু ছিল, তার সঙ্গে—এদের যদি সংস্কৃতি বলে কিছু থেকেও থাকে, তার কোন মিলই নেই। হয়ত সত্যবিজয় এদের ভালভাবে চেনে। সত্যবিজয় যখন এদের বাড়িতে যায় তখন বোধহয় সংস্কৃতির পুরোনো ছাঁচের মুখোস দেয়াল থেকে নামিয়ে ধূলো ঝেড়ে মুখে পরে, অনন্তবিজয়ের সামনে দাঁড়ায়। আকাশ ঠিক বুঝতে পারে না।

চলতে চলতে সন্ধে হয়ে যায়। এভাবে এত দীর্ঘ পথ আকাশ বহুদিন চলেনি। ইস্কুলে যখন সে পড়ত, তখন একটা অদ্ভুত নেশা ছিল। এরিয়ান্সের খেলা দেখার জন্যে তার মন ছট্‌ফট্‌ করত। ভাল টিমের বিরুদ্ধে টিকিট সংগ্রহের সামর্থ ছিল না। অন্যান্য সাধারণ টিমের সঙ্গে এরিয়ান্সের খেলা হলে সে খেলা দেখতে যেত। এরিয়ান্স জিতলে খুব আনন্দ হতো। এখনও হয়। আর হারলে সারাদিন মন খারাপ থাকে এখনো। সেই সময় সে মাঠ থেকে কখনো একা, কখনো অচ্যুতের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরত। সন্ধে হতে না হতে বাড়ি পৌঁছে যেত।

আজকের চলায় সেসব দিনের দ্রুততা নেই। মায়ের কথা যে এক আধবার মনে হয় নি তা নয়। মা এমনিতে ভালই আছে। কিন্তু পুরোপুরি ভাল বলা যায় না। একটু ভীত ভাব এখনো রয়েছে। মায়ের কথা ভেবেও চলার গতি বাড়ায় না আকাশবিজয়।

বাড়ির কাছাকাছি অনেক খানি ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। সেটিকে পার্ক হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সি. আই. টির। একদিকে লেডিস এবং অন্যদিকে শিশুদের নানান খেলার সরঞ্জাম থাকবে। মাঠের বুক-চিরে পায়ে ছাঁটা পথ। সর্ট কাট করে এ পাড়ার মানুষেরা। জায়গাটা অন্ধকার। দূরে যে একটা লাইট পোস্ট রয়েছে, তার বাল্‌বও ফিউজ কিংবা চুরি।

আকাশ সেই পথ দিয়ে একটু এসেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ শোনে। মেয়েলী কণ্ঠ। সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখে একটা প্রাইভেট কার ইঞ্জিন চালু অবস্থায় দাঁড় করানো রয়েছে। আর দুজন লোক একটি মেয়েকে জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে সেই গাড়ির খোলা দরজার দিকে। মেয়েটি সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিয়েও পারছে না দুজনার সঙ্গে। তার শাড়ি বিস্রস্ত—চুল এলোমেলো।

একজন বলে—হারামজাদীর গায়ে জোর আছে।

আর একজন বলে—মার শালীকে এক থাপ্পর।

একজন সত্যিই থাপ্পর মারে। অন্যজন চুল ধরে টানে।

আকাশ এমন পরিস্থিতির মধ্যে কখনো পড়েনি। জায়গাটা বড্ড অন্ধকার। নইলে চেঁচিয়ে লোক ডাকতো। মেয়েটি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। জীবনে আকাশ কাউকে আঘাত করেছে বলে মনে পড়ে না। হ্যাঁ, একবার একজনকে আহত করেছিল। অচ্যুতকে। দোলের দিনে অচ্যুত এসে অনেক সকালে তার গায়ে রঙ দিয়েছিল। আকাশ অপ্রস্তুত ছিল তখনো। গায়ে তার যে জামাটি ছিল, সেটি পরে ইস্কুলে যেত। অন্য কোন ভাল জামা সেই সময়ে ছিল না। তার প্রায় কান্না পেয়েছিল। অচ্যুতকে দৌড়ে পালাতে দেখে, সে একটা ছোট ইটের টুকরো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিল। অচ্যুত অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিল। অথচ ইটটা গিয়ে ঠিক তার মাথার পেছন দিকে লেগেছিল। অচ্যুত থেমে পড়ে পেছনে হাত দিয়ে দেখে তার হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে। সে কেঁদে উঠে আকাশের দিকে ছুটে এসে বলে উঠেছিল—আকাশ রক্ত পড়ছে। সত্যি সত্যি লেগেছে।

আকাশ তাড়াতাড়ি তার মাথা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে দেখে সত্যিই তাই। সে তখন কাঁদতে কাঁদতে অচ্যুতকে নিয়ে অনন্ত-বিজয়ের ঘরে ঢুকে বলেছিল—আমি অচ্যুতের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি! আমি গুণ্ডা হয়ে গিয়েছি। আমার কি হবে দাদু?

কথাটা বাড়িতে বহুদিন আলোচিত হতো। কী করবে ভেবে না পেয়ে আকাশ প্রাইভেট গাড়ির খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

মেয়েটিকে সে কিছুতেই গাড়িতে তুলতে দেবেনা। এত চট্‌পট্‌ কি করে তার বুদ্ধি খুললো, সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

সরে যা শূয়ার কা বাচ্চ।

আকাশ বলে—ওকে ছেড়ে দাও।

সরে যা—

আমি সরব না।

মেয়েটিকে ছেড়ে আকাশকে মারতে পারেনা দুজনা মিলে। মেয়েটি পালাবে তাহলে।

আকাশ ভাবে ওদের কাছে ছুরি কিংবা পিস্তল থাকলে বিপদ। মরতেই হবে। না মরলেও ভাল রকম আহত হতে হবে। জায়গাটায় অন্ধকার না থাকলে ইঁট কিংবা কিছু হাতে নিয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারত।

আকাশের হঠাৎ নজরে পড়ে জনা তিনেক লোক একটু দূর দিয়ে মাঠ পার হচ্ছে। সে চেঁচিয়ে ডাকে—এই যে শুনছেন? শিগ্‌গির এদিকে আসুন। শিগ্‌গির—ভীষণ বিপদ।

লোক তিনজন প্রথমে থতমত খায়। ভাবে, যাওয়া উচিত হবে কিনা। বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে কেউই চায় না বড় একটা। তবু এগিয়ে আসতে লাগলো অবশেষে। বোধহয় দলে ভারী বলেই। ওদের আসতে দেখে এরা আকাশকে প্রচণ্ডভাবে লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে উধাও হয়। শুধু লাথি নয় ঘুষিও মেরেছিল ওরা। তবে খুব একটা শক্তিমান বলে মনে হলো না আকাশের। কারণ সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সে বুঝল ওরা নিরস্ত্র ছিল।

আপন মনে আকাশ বলে ওঠে,—যাঃ নম্বরটা নেওয়া হলো না। যা অন্ধকার। ওরা লাইট না জ্বালিয়ে পালালো।

মেয়েটি ততক্ষণে তাড়াতাড়ি তার শাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে গায়ে জড়াতে থাকে।

লোক তিনজন এসে বলে—চাপা দিয়ে পালায় নি, আপনাদের ভাগ্য ভাল। কি করছিল? ছিনতাই?

আকাশ কিছু বলতে পারে না।

ওদের একজন বলে—আপনারও কাণ্ড যেমন। এই অন্ধকারের মধ্যে মেয়েদের নিয়ে কখনো যেতে হয়? জানেনই তো কলকাতা আর কলকাতা নেই।

মেয়েটি শাড়ি পরে ফেলে।

আকাশ বলে—আমি একাই যাচ্ছিলাম, সেই সময় দেখি এঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। যা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না।

ওরা মেয়েটিকে বলে ওঠে—আপনার সাহস তো বড় কম নয়। কী শক্ত মেয়ে আপনি। এত কিছুর পরেও, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয় নি। ওই ডোণ্ট কেয়ার ভাবের জন্যেই বিপদে পড়েছিলেন। অন্য মেয়ে হলে এতক্ষণে অন্তত কাঁদত।

মেয়েটি এগিয়ে এসে আকাশকে জড়িয়ে ধরে ক্লান্তভাবে বলে,—আকাশদা।

আকাশ মেয়েটির থুতনি তুলে ধরে বলে—কল্যাণী! তুই!

ওরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—ইনি কে হন আপনার।

আমার বোন। আর আমিই চিনতে পারিনি।

দেখেছ কাণ্ড। তবুও ভাল আপনি এসে পড়েছিলেন!

আকাশের উত্তেজনা এতক্ষণে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয়। কল্যাণীকে ওরা আর একটু হলে তুলে নিয়ে যেত! কী সাংঘাতিক।

ওদের একজন বলে—আপনি মশায় লোক হিসাবে ভাল বলতে হবে। উনি আপনার বোন, তা তো জানতেন না। তবু রুখে দিয়েছেন।

আমি? আমি রুখলাম কোথায়? আমি শুধু দরজাটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম।

কল্যাণী বলে—না, আকাশদাই রুখে দিয়েছেন। অন্য কেউ হলে আসতো না। পারতো না!

তুই কী বলছিস যা তা। আমাকে নতুন দেখছিস নাকি?

ওরা বলে—আপনারা এখন ঝগড়া করুন। আমরা চলি।

আকাশ বলে—আসল রক্ষা কর্তা আপনারা। আপনারা এসে ছিলেন বলেই ওরা পালালো। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।

ওরা হাসতে হাসতে চলে যায়।

আকাশ বলে,—তোর সাহস বড্ড বেড়েছে কল্যাণী। এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে একা আসতে হয়? আমি জানতাম পৃথিবীটাকে তুই—আমার চেয়ে বেশী চিনিস। এখন দেখছি তা নয়।

চল, আকাশদা। বড় ক্লান্ত লাগছে।

হ্যাঁ চল্, লাগবেই তো। ভাবতেও পারি না। বাড়িতে গিয়ে কিছু বলিস না কাউকে।

না। আমি তোমার হাত ধরব?

ধরবি না কেন? হাত ধরেই তো ইস্কুলে যেতিস। আমি আমার কড়ে আঙুল ধরতে বলতাম, তুই ধরতিস বুড়ো আঙুল। চিরকাল তোর বড্ড জেদ।

আকাশ কল্যাণীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু কল্যাণী কিছু বলে না। বেচারা যতই শক্ত মেয়ে হোক, আজ একটু আগের ঝড় তাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে।

তুমি কোথায় গিয়েছিলে আকাশদা?

ইণ্টারভিউ দিতে।

এত দেরী হলো কেন?

হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম। বেশ লাগছিল।

ভালই করেছিলে।

হুঁ।

আমার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে?

না। ভাবছি কলকাতায় এসব হতে কখনো শুনিনি।

অনেক কিছুই আগে বোঝা না গেলেও পরে বোঝা যায়:

তুই কিন্তু আবার ফর্মে ফিরে আসছিস।

কল্যাণী এতক্ষণে একটু জোরে হেসে ওঠে।

আকাশের মনটা হাল্কা হয়। মনে মনে কল্যাণীর প্রশংসা না করে পারে না। দিগ্বিজয়ের বোন বলেই কল্যাণীর এতটা মনের জোর। অন্য কেউ হলে, একা একা তুজনার বিরুদ্ধে লড়তে পারত না। লড়লেও, পরে অজ্ঞান হয়ে যেত। কল্যাণী অন্য ধাতুতে গড়া।

একটু সকাল সকাল বাড়ি ফেরার চেষ্টা করিস।

তুমি আবার সুরু করলে।

ঠিক আছে। যা ভাল বুঝিস করিস।

কল্যাণীর মুখের ফিঁকে হাসি আকাশের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

সে বলে,—এখনো বুড়ো আঙুল ধরে আছিস কেন ? বাড়িতে তো পৌঁছে গেলাম।

বারে, আঙুল যখন ধরেছি ঘর অবধি পৌঁছে দাও। এখন অবিশ্যি বাবা নেই বাড়িতে। তখনো কতদিন থাকতো না। মরমীদি নিয়ে গিয়ে বিকেলের খাবার দিত ইস্কুল থেকে ফিরলে।

তোর আবার ছোট হবার সখ হয় নাকি।

হ্যাঁ। খুব হয়। তাহলে নিজেকে আর একটু ভাল করে গড়ে নিতে পারতাম।

গড়ে নেবার অনেক বয়স আছে। তুই তো ছোট। বলতে গেলে প্রায় কিশোরী।

কলেজে পড়ি।

তাতে কি। আমাদের সময় বড় বড় মেয়েরা কলেজে পড়ত। এখন তো সব ছোট ছোট।

কী যে বল। তুমি বড় হয়ে গিয়েছ বলে, সবাইকে ছোট দেখ।

তাই হবে হয়তো।

আকাশবিজয় কল্যাণীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের ঘরের সামনে গিয়ে দেখে মরমী সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে কি করছিস, মরমী।

বাবা দিগ্বিজয়দাকে বারবার খুঁজতে আসছে এ-ঘরে। তাই দাঁড়িয়ে আছি। ওই রেলিংটা খারাপ তো। বাবার কথা বলা যায় না।

কল্যাণীদের বারান্দায় রেলিং লোহার হলেও শেষ অবস্থা। কেউ গিয়ে একটু ভর দিলে ভেঙে পড়তে পারে। দু'এক বছর আগে পৃথ্বীবিজয় বাঁশ এনে বেঁধে দিয়েছেন। সেই বাঁশও জীর্ণ হতে হতে খসে পড়েছে।

সেই সময় পাশের একটা ঘরে, অমরবিজয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

কতকগুলো ইতর চোর ডাকাত ধরলেই কি রাজ্যশাসন হলো? তারা তো রাতে কুকাজ করে। আর এইসব নীলকর সাহেবরা। রাজপুরুষদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আহার করছে, ডান হাতে গ্লাস ধরে সুরাপান করছে। আবার চার্চে গিয়ে গদগদ চিত্তে প্রেমাশ্রুপাত করে মহাপ্রভু যীশুখৃষ্টের উপাসনা করছে, তারাই গ্রামে গিয়ে দিন-দুপুরে অত্যাচার করছে। ধর্ষণ করছে? কখনো চলবে না। দিগু —এই দিগু, এখনো ফিরছে না কেন দিগু। যাই দেখে আসি।

অমরবিজয়ের পদধ্বনি শোনা গেল।

মরমী বলে,—বিকেল থেকে বারবার এ-ঘরে আসছে। নীলকর সাহেবদের ভূত মাথায় চেপেছে।

আকাশকে দেখে অমরবিজয় বলে এই যে দিগু—

আমি আকাশ।

কে? আকাশ? না না, আকাশ টাকাশ নয়। আমি দিগ্বিজয়কে চাই। সব দিক জয় করে ফিরবে। চেনো তাকে?

আকাশ চুপ করে থাকে। আজ অমরবিজয়, আকাশ কেও চিনতে পারবে না। মরমীকেও নয়।

কথা বলছ না কেন? চেনো? চিনবে না। ক'জনা চিনতে পারে। দিগ্বিজয়ের ভেতরে একটা প্রকাণ্ড সূর্য আছে। সেই সূর্য সব কিছুকে আলোকিত করে। আবার যত আবর্জনা যত পাপ সব পুড়িয়ে খাক করে দেয়। হ্যাঁ। দিগু—তাড়াতাড়ি আয়। এই অত্যাচারীদের পুড়িয়ে দে, ধ্বংস করে দে।

কল্যাণী বলে—দাদা নেই।

দাদা ? কে দাদা ?

আমার দাদা। দিগু। যে ওই বাগানের ভেতরে পাতালের ঘর থেকে যুদ্ধ করতে করতে চলে গেল।

যুদ্ধ ? হ্যাঁ হ্যাঁ—যুদ্ধ করেছিল বটে। ঠিক। যুদ্ধ করেছিল বাঘা যতীন। ঠিক। কিন্তু কোথায় গেল ? ওকে যে আমার বড্ড দরকার। এই পৃথিবীর দরকার। ওকে না হলে যে আমি নিঃস্ব।

অমরবিজয়ের মুখ ব্যথায় কেমন হয়ে ওঠে। সে বুক চেপে ধরে টলতে টলতে আবার নিজের ঘরে ফিরে যায়।

আকাশের চোখে জল ফুটে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সামলে নেয়। কল্যাণী একদৃষ্টি চেয়ে থাকে তার নিজের ঘরের দিকে—যেন ঘরের মধ্যে দাদা সত্যিই বসে রয়েছে।

মরমী বলে—আমি আর পারিনা।

আকাশের কষ্ট হয় মরমীর জন্যে।

সেই সময় সুচিত্রা কাকী হাতে একটা চিরুণী নিয়ে এসে দাঁড়ায়। ওরা তিনজনই একটু অপ্রস্তুত হয়। শকুন্তলার ব্যাপারটা তিনজনেই জানে। সুচিত্রা কাকী কখনই জানে না।

কিরে, তিনজনে এখানে।

মরমী বলে—বাবা একটু বেশী অস্থির হয়েছে আজকে।

হ্যাঁ জানি। তাই দেখতে এলাম। উনি ঘরে !

এইমাত্র গেল। একটু পরেই আবার উঠে আসবে। দিগ্বিজয়দাকে খুঁজছে।

শকুন্তলাকে দেখেছিস কেউ ?

আকাশ রীতিমত সচকিত হয়ে ওঠে। বলে—ঘরে নেই ?

না।

কখন বার হয়েছে।

সন্ধের একটু পরে।

তুমি ছেড়ে দিলে ?

ছেড়ে না দেবার কি আছে, কার ঘরে যাচ্ছে বলল।

কার ঘরে ?

কাজে ব্যস্ত ছিলাম। ঠিক মত শুনতেও পাই নি।

কল্যাণী বলে—আছে কোন ঘরে। এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। একটু পরেই ফিরবে।

সুচিত্রা কাকী বলে—কার ঘর আর বাকী রইল। কিছুদিন থেকেই চালচলন কেমন অন্যরকম দেখছি। পলিটিকস্ করছে নাকি।

কল্যাণী হেসে বলে—শকুন্তলাদি কোনদিন রাজনীতি করবে না। সেই মেয়েই নয়।

তবে গেল কোথায় ?

আকাশের মনে ক্ষোভ জমে ওঠে। এভাবে এতরাতে বাইরে থাকা কখনই উচিত নয়। অচ্যুত অন্তত ছেলেমানুষ নয়।

সুচিত্রা কাকী বলে—ঠিকমত চুলও বাধতে চায় না। কি ছিরি হয়েছে চুলের। তাই আজ ঠিক করেছি ওর চুল বেধে দেব যখনই আসুক। তাই চিরুণী নিয়ে ঘুরছি।

কল্যাণী বলে—অত বড় মেয়ে চুল বেঁধে দেবে কি। সে সব দিন আছে নাকি ? আমার চুল বেধে দেয় কে ?

সুচিত্রা কাকী হেসে বলে—চল্, আমিই দিচ্ছি।

না। আমি চুল ছোট করে ফেলব।

কী সব বাজে কথা বলিস।

সুচিত্রা কাকী শকুন্তলার খোঁজে অন্য দিকে চলে যায়।

দুদিন পরে মাঝরাতে শকুন্তলার আর্ত চিৎকারে সবার ঘুম ভাঙল। শুধু মা উঠল না। নীতিন ডাক্তার সব শুনে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন। খুব কাজ হয়েছে। ইন্দ্রবিজয়ের কথাও আর বলেনি এর মধ্যে। বেশ স্বাভাবিক।

অনন্তবিজয় তার ঘর থেকে হেঁকে জিজ্ঞাসা করে—অমন বিশ্রীভাবে চেঁচায় কে রে আকাশ ? কি হয়েছে ?

আকাশ তাড়াতাড়ি দাদুর ঘরে এসে বলে—বোধহয় শকুন্তলা।

দেখে আসছি।

দেখে আয় চট্ করে। দিনে রাতে শান্তি দেবে না দেখছি।

শকুন্তলাদের ঘরের দিকে যেতে আকাশের বুকটা কেঁপে ওঠে। প্রশান্তবিজয় বাড়িতে নেই। 'মরিময় বেগম' পালা হিট করেছে। প্রতিদিন বুক করা আছে বাঙলার গ্রামে গঞ্জে। বর্ষার পর পরই শুরু হয়ে গিয়েছে। চাষীদের ঘরে এবারে নাকি ফসলও ভাল আছে। প্রায় সব জায়গাতে কোল্ড স্টোরেজের সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছে ওরা। লোড-শেডিং কম। কারণ কিছুদিন আগে অবধি ইউনিয়নে মারামারি করে এখন তারা নাকি দম নিচ্ছে। চেয়ারম্যানও একটু আঙুল বাঁকা করেছেন। তাই ওরা আগামী গরমকালে বিপ্লবাত্মক প্রোগ্রাম নেবার পরিকল্পনা করছে আপাতত।

শকুন্তলাদের ঘরের সামনে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। মরমী আর তার মা মেঝেতে বসে পড়ে কাঁদছে। শুধু কল্যাণী বুকের ওপর দু'হাত রেখে সোজা দাঁড়িয়ে দেখছে।

আকাশকে দেখে কল্যাণী বলে—পুলিশে খবর দাও আকাশদা।

কি হয়েছে ?

কি হয়েছে বলতে হলো না। সুচিত্রা কাকী ঝুলছে। বিছানার পাশেই। ফ্যানের সঙ্গে দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা।

শকুন্তলা ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে—আমি একটুও বুঝতে পারিনি। কাল ঘুমে পেয়েছিল। এখন কি করব ? বাবা কি বলবে ?

আকাশ দেখল সুচিত্রা কাকী একেবারেই মরে গিয়েছে। হাত-পা শক্ত শক্ত। চোখ দুটো কিন্তু বোঁজা। সামান্য জিভ বার হয়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে বিশেষ লড়াই করেনি। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পন করেছে। মুখে সারা জীবনের অবসাদ আর বিষাদ মাখানো। জীবনের সব গর্ব তার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কল্যাণী এগিয়ে এসে ধমকের স্বরে শকুন্তলাকে বলে—খবরটা একা একা দিতে গেলে কেন ? সবার সামনে দিনের বেলায় বলতে পারলে না ?

আমি ইচ্ছে করে দিইনি। হঠাৎ আমার চুল আঁচড়ে দেবার শখ হলো। আমিও একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তখনি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছিল—এটা কি? সিঁদুর কেন?

মিথ্যে কথা বলতে পারলে না?

না। মুখে এলো না।

বোকা একটা।

মরমী ছাড়া বাড়ির আর সবাই এ ওর মুখের দিকে চায়। আকাশ তখন ছোট্ট করে ঘটনাটা বলে দেয়। প্রতিক্রিয়া একটাই। ঘৃণায় সবার মুখ কুঁচকে ওঠে। শকুন্তলার প্রতি এতক্ষণের সহানুভূতি বিদ্বেষে পরিণত হয়।

সেই সময় কল্যাণীর বাবা পৃথ্বীবিজয় আসে। সব দেখে শুনে বলে—বউদি চিরকাল হা-হুতাশই করে গেল। যা হোক, আকাশ তুমি এখনি থানায় চলে যাও। আর শকুন্তলা মরা কান্না কাঁদতে হবে না। দাদা কোথায়?

শকুন্তলা কেঁপে উঠে চুপ করে যায়। তারপর আস্তে আস্তে বলে—ঠিক জানি না। বোধহয় দাঁতনে।

বোধহয়-টোধহয় চলবে না। ঠিক আছে। কল্যাণী, পুলিশ এলে আমাকে খবর দিস। পুলিশ দাদার কম্পানীর কাছ থেকে খবর নিয়ে দাদাকে জানাতে পারবে।

মরমীর মাকে কাঁদতে দেখে পৃথ্বীবিজয় বলে—বৌঠান, এখনো জল আছে দেখছি চোখে? আপনার জল তো কবেই সুকিয়ে যাবার কথা।

হ্যাঁ, ঠিক। সুকিয়ে যাবারই কথা। কিন্তু শকুন্তলা এ কি করল?

কি করেছে?

অচ্যুতকে বিয়ে করেছে।

তাই নাকি? সেজন্যেই আত্মহত্যা? তাই বল। আমি ভেবেছিলাম দাদার জন্যে। তবু ভাল।

পৃথ্বীবিজয় আর কিছু না বলে নিজের ঘরের দিকে চলে যায়।

আকাশ ভাবে, পৃথ্বীবিজয় এমন বলেই তার দিগ্বিজয় আর কল্যাণীর

মতো ছেলেমেয়ে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আকাশ। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ। সবাই ভেবেছিল, আত্মহত্যার আগে সুচিত্রা কাকী কিছু লিখে-টিখে যায়নি। কিন্তু পুলিশ এসে খুঁজে বার করল। বিছানার পাশে শকুন্তলার বই-এর ভাঁজে। একটা কাগজে দু ছত্র লেখা—জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হলাম। স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছি। দায়ী কেউ নয়। ওরা সুখে থাকুক।

শকুন্তলা ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

পুলিশ প্রশান্তবিজয়ের খবরটা জেনে নিয়ে বলে তার কাছে খবর পৌঁছোবে। সেখানকার থানায় রেডিওগ্রাম করে দেবে।

অবশেষে ভোররাতে পুলিশ সুচিত্রা কাকীর লাশ নামিয়ে নিয়ে যায়। বলে বিকেল তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ লাশ দিয়ে দেওয়া হবে শেষকৃত্যের জন্য। কোথায় যেতে হবে, সব ওরা বলে দিয়ে যায়।

একটু পরেই আলো ফোটে।

অনন্তবিজয় আত্মহত্যার ঘটনাটা আগেই জেনেছিল। কিন্তু কী কারণে এই আত্মহত্যা সেটুকু জানল সকালবেলায়।

শুনেই চমকে উঠে বলে—আমাদের সেই গোয়ালাটার নাতি? এত অধঃপতন? বউমা তো ঠিকই করেছেন। ও-মুখ দেখাতেন কেমন করে? প্রশান্ত যেন মেয়েকে নিয়ে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বলে দিও এটা আমার হুকুম। এ-বাড়িতে থাকার অধিকার ওরা হারিয়েছে।

আকাশের মায়ের রাতে খুব ভাল ঘুম হয়েছিল। পরপর তিনদিন একঘুমে রাত শেষ হয়েছে। কতদিন পর। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনা শুনে মুখের খুশি খুশি ভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো।

বলল—জানতাম। ইন্দ্রবিজয় ছোটাছুটি করলে কি হবে? ঠেকাতে পারবে না। সব মরবে একে একে। চল আমরা পালিয়ে যাই। ওই বুড়ো মরুক এখানে।

ঘুমের ওষুধের সুফল এক আঘাতেই মাটি।

যাব মা। নিশ্চয় যাব। আর কিছুদিন।

মনে মনে আকাশ ভাবে, এখন সত্যবিজয় এলে সে লড়ে যাবে শাত্রুর সঙ্গে। আর ওই সেকেলেপনা ভাল লাগে না। কবে ঘি খেয়েছে এখনো হাতে গন্ধ শুঁকছে।

কাশী মিত্তির শ্মশানঘাটে এই পরিবারের সবাইকে মৃত্যুর পর নিয়ে আসা হয়। আকাশ শেষ দেখেছে চপলাসুন্দরীর নশ্বর দেহ দাহ হতে এখানে। অথচ গজ-ফুট দিয়ে মাপলে নিমতলা মহাশ্মশান বাড়ি থেকে কিছুটা কাছে। তবু এটাই পরিবারে চল হয়ে এসেছে। নিয়মের ব্যতিক্রম যত না ঘটে ততই তো আভিজাত্যের বর্ণচ্ছটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রশান্তবিজয় সেদিন পৌঁছোতে পারেনি। পৌঁছেছিল পরদিন দুপুরে। এসে ঘণ্টা দুয়েক স্তম্ভিত হয়ে বসে ছিল। তারপর শকুন্তলাকে ডেকে বলল—ওই গোয়ালাটা এসেছিল?

শকুন্তলা উত্তর দেয়নি। আসলে অচ্যুত যে এসেছিল সে-ও জানে না। রাতের অন্ধকারে সে এসেছিল। বৈঠকখানা ঘরে চোরের মতো বসেছিল আকাশকে ধরবে বলে শ্মশানফেরতা। ধরেও ছিল।

আমার কি করা উচিত আকাশ?

আগে ভাবিসনি?

এমন হবে জানতাম না।

তোর বাবা কি বলেন?

কথা বলছে না। বাড়ির কেউ কথা বলছে না। পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

ভুল করছিস। আর কেউ না থাকুক শকুন্তলা রয়েছে। তোকে তো বাস্তববাদী বলে জানতাম।

আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এমন হবে কল্পনাও করতে পারিনি।

তোর পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তোর তো দেমাকভরা বংশ নেই। থাকলে কিছুটা বুঝতিস। দাঁড়া একটু। ভেতর থেকে আসছি।

কাউকে বলিস না।

না না।

আকাশ গিয়ে কল্যাণীকে ডেকে এনেছিল। নিজের ওপর ভরসা পায় না। শকুন্তলার স্বার্থ কল্যাণী ভাল বুঝবে। এতদিন অচ্যুতই তার ভরসা ছিল। এখন সে-ও কেমন দিশেহারা। সুতরাং কল্যাণীর ওপর নির্ভর করা ভাল।

অচ্যুতকে দেখেই কল্যাণী বলে—শকুন্তলাদিকে নিতে এসেছ নাকি?

না না। কী করব সেই পরামর্শ নিতে এসেছি আকাশের কাছে।

কী আবার করবে? নিয়ে যাও। এ বাড়িতে শকুন্তলাদি থাকতে পারবে না। ওর বাবাই ওকে সহ্য করতে পারছে না।

কিন্তু আমার বাড়ির সবাই আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? দুদিন পরে আবার কথা বলবে। শকুন্তলা-দিকে নিয়ে যাও।

যদি ত্যাজ্যপুত্র করে?

বয়ে গেল। দুজনা আলাদা নিজের মতো থাকবে।

চলবে কি করে?

তোমার নামে কোনো দোকান নেই অচ্যুতদা? অনেকগুলো তো ব্রাঞ্চ খুললে।

সব বাবার নামে। তাই তো ভাবছি।

কল্যাণী রীতিমত বিরক্ত হয়। সেই বিরক্তি তার চোখে-মুখে প্রকট হয়ে ওঠে। সে বলে—ভাবনাটা আগে ভাবলেই পারতে। এই ক্ষতি শুধু তোমার জন্যে হলো। তোমাদের মতো কতকগুলো রোমিও অনেক ক্ষতি করে বেড়ায়!

আমি রোমিও নই। শকুন্তলা ধরা না পড়লে সব ঠিক হয়ে যেত।

কল্যাণীর মুখে এবারে এক ধরনের ঘৃণা ফুটে ওঠে। সে বলে—আমাকে নিয়ে যেতে পারবে তোমাদের বাড়িতে?

তুমি?

হ্যাঁ। চল, আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলব।

কল্যাণী সত্যিই ওদের বাড়ি গিয়েছিল এবং সব মিটিয়ে দিয়েছিল। লক্ষ্মীকান্ত একটা পাপবোধে জর্জরিত হয়েছিল। কল্যাণীর যুক্তিতর্কের জোরে ধীরে ধীরে সহজ হয়ে উঠেছিল। ঠিক হলো, কয়েকদিন অন্য জায়গায় রেখে শকুন্তলাকে ঘরে নিয়ে আসবে লক্ষ্মীকান্ত।

আকাশ, কল্যাণী আর মরমী ছাড়া বাড়ির সবাই শকুন্তলার মুখের দিকে অবধি চাইল না, কথা বলা তো দূরের কথা। প্রশান্তবিজয় অবধি চুপ।

বিদায় নেবার সময় প্রশান্তবিজয়ের পা ধরে কী কান্না, শকুন্তলার। প্রশান্তবিজয়ও কেঁদেছিল। স্ত্রীর অপঘাত মৃত্যু হলো। তারপরই একমাত্র কন্যা বিদায় নিল। পৃথিবীতে কেউ থাকল না তার। মনে হয়েছিল তার এখন বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা। তবু আত্মহত্যা সবাই করতে পারে না। তাকে বাঁচতে হবে। আর বাঁচতে হলে যাত্রার দলে সঙ সেজে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে ঘুরতে হবে যতদিন না অশক্ত হয়ে পড়ে কিংবা কোম্পানী তাকে বাতিলের দলে ফেলে দেয়।

আকাশ লক্ষ্য করেছিল পিতা আর কন্যার মর্মান্তিক বিদায়ের দৃশ্যে বাড়ির সবার চোখে জল এসেছিল, কিন্তু কল্যাণীর মুখ হাসি হাসি।

তোর হাসি পেল কি করে কল্যাণী ?

হাসি পায়নি। তবে দুঃখও হয়নি এমন কিছু।

বাবা আর মেয়ের সম্বন্ধ কিছু নয় ?

সেটা থেকেই যায়। তবে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নয়; তেমন হলে শকুন্তলাদির জীবনটা আটকে যেত।

তুই ভীষণ ডাকসাইটে। এতটা ভাল নয়।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা এ বাড়ির একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তুমি ভাবছ বুঝি পৌরাণিক। তাই তোমরা অত থমথমে।

আকাশ উত্তর দেয় না।

প্রশান্তবিজয়ের স্ত্রী-বিয়োগ এবং শকুন্তলার বিদায় এ বাড়ির মূলে প্রচণ্ড এক ঝাঁকানি দিয়ে গেল। তারপর থেকে সবই কেমন নড়বড়ে।

অনন্তবিজয় খাটের ওপর বসে আগের মতই দোল খায়, সন্ধ্যায় আফিমের কৌটোর দিকে হাত বাড়ায়, দুপুরের নিঃস্তব্ধতায় বাড়ির পেছনে মরমীর ঘুঁটে দেবার থপ্ থপ্ শব্দ হয়, অমরবিজয় মেডিকেল কলেজের ডেভিড হেয়ারের স্মরণ সভার জন্য একটা বক্তৃতা প্রস্তুত করে ফেলে আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে। সবই আগের মতই চলছে। কিন্তু কি যেন চিরকালের মত হারিয়ে গিয়েছে এ-বাড়ি থেকে। অনন্তবিজয়ের এক এক সময় মনে হয় সারা কলকাতার মানুষ তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে। প্রশান্ত এককালে এ বাড়ির সম্মান কিছুটা জলাঞ্জলি দিয়েছিল যাত্রা পার্টিতে নাম লিখিয়ে এবারে ওর মেয়েটা মাথাটা একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

জরাজীর্ণ হলেও এ-বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মুখুজ্জে বাড়ি ছাড়ব ছাড়ব করেও কিসের মায়ায় যেন ছাড়তে পারেন নি এতদিন। এবারে জীর্ণ বস্ত্রের মত বাড়িটাকে পরিত্যাগ করে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন। বাড়িটার এতদিনে আত্মাছিল, এখন শবদেহ পড়ে রয়েছে শুধু।

অনন্তবিজয় এতদিন যখের মতো বাড়ি আগলে বসে ছিল, এখন যেন এ বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে আসে। ভেতরটা ছটপট্ করে শুকিয়ে আসে। একদিন হঠাৎ আকাশকে ডেকে প্রশ্ন করে—ওটার ঠিকানা জানিস ?

আকাশ বুঝতে না পেরে চেয়ে থাকে।

কিরে উত্তর দিচ্ছিস না কেন ?

কার ঠিকানার কথা বলছ ?

ওই যে চামড়ার ব্যবসা করে।

ও।

ও কি ? জানিস ?

ঠিকানা জানি না। তবে বাড়িটা জানি।

বাড়িটা জানিস ? তুই গিয়েছিলি নাকি ?

না। আমাকে যেতে বলেছিল বহুবার। তখনি জেনে নিয়েছিলাম।

অনন্তবিজয়ের মুখে যেন একটু হাসি ফুটে ওঠে—ও যাসনি। যা হোক এবার ওকে একটা খবর দে।

আকাশ অবাক হয়।

শকুন্তলা চলে যাবার পর থেকে আকাশ লক্ষ্য করছে অনন্তবিজয়ের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটছে। এতদিনের উঁচু মাথাটা সামনে নুয়ে পড়েছে। বুকের ওপর হাত বোলায় মাঝে মাঝে। কেউ দেখে ফেললে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়। আফিমের পরিমাণ কমে গিয়েছে।

আকাশ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার ডাকি।

ডাক্তার? ডাক্তার কি করবে? সাধ্য কি তার?

ওষুধ দিলে ভাল হতো।

না। শকুন্তলাটা ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছে। লুকোবার আর জায়গা নেই। এ-বাড়ি আর রাখব না। বেচে দেব। সত্যকে খবর দে।

আকাশ সত্যবিজয়ের বাড়ি না গিয়েই তাকে ফোন-এ পেয়ে গিয়েছিল। সব শুনে শান্ত স্বরে বলেছিল—ঠিক আছে, কাল সকালে যাব।

আকাশ ভেবেছিল, সে নিজে না গিয়ে ফোন করাতে সত্যবিজয় হয়ত অনুযোগ করবে। কিছুই করল না। বুঝতে পারে, ওদের মতো ব্যস্ত মানুষরা কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে থাকে না। তাছাড়া যাতে বিশেষ কোনো স্বার্থ জড়িয়ে নেই সে-সব কথা ওদের হয়ত মনেও থাকে না। ওরা অনন্তবিজয় নয়—নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে রাখতেই জীবন চলে যায় না ওদের।

পরদিন সত্যবিজয় ঠিক সময়ে আসে। শান্তভাবে অনন্তবিজয়ের ঘরে ঢুকে যথারীতি পায়ের ধুলো নিয়ে বলে—আমাকে ডেকেছিলেন?

অনন্তবিজয় বালিশে ঠেস দিয়ে বসেছিল। সত্যবিজয় পায়ের ধুলো নিলেও অনড়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সত্যবিজয় আবার বলে

—আমি এসেছি কাকা। আপনি শুনলাম ডেকেছিলেন।

অনন্তবিজয় হঠাৎ বলে ওঠে—না না, ডাকিনি। আমি কিছুদিনের মধ্যেই মরব। তারপরে এসো।

কিন্তু আকাশ আমাকে ফোনে বলল—

ও ভুল করেছে। হলো তো?

সত্যবিজয় একটু অপেক্ষা করে বলে—বেশ। আমি তাহলে চলি।

অনন্তবিজয় খপ্ করে ওর হাত চেপে ধরে। কী যেন বলতে চায়। মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

কিছু বলবেন?

দুফোঁটা ঘোলাটে জল গড়িয়ে পড়ে অনন্তবিজয়ের চোখ দিয়ে, ফ্যাঁসফেসে গলায় বলে—পারলাম না সত্য। সব ভেঙে পড়ছে।

সত্যবিজয় খাটে বসে অনন্তবিজয়ের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলে—কোনো কিছুই অক্ষয় নয় কাকা। সব পুরোনো হয়—শেষে ভেঙে পড়ে। সেটাকে মেনে নিলে শান্তি পাওয়া যায়।

তুমি আমাকে লেকচার শোনাচ্ছ?

না। জিজ্ঞাসা করলেন। তাই বললাম। আপনি আঁকড়ে ধরে বাঁচাতে পারবেন না। এখানে আপনারা যাঁরা আছেন, প্রত্যেক পরিবারের জন্যে বৈষ্ণবঘাটায় দুই কামরার ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে রেখেছি। কোনো অসুবিধা হবে না। কিছু টাকাও দেব। আপনারা ভাল থাকবেন নতুন জায়গায়। পরে যারা দাবী করবে, তাদের জন্যেও সংস্থান রয়েছে দলিলে।

তুমি কি আমাদের বংশের দিকে তাকিয়েই এই ব্যবস্থা করেছ?

নিশ্চয়। আমি জানি অন্য অনেকে বেশি টাকার লোভ দেখালেও আপনি তাদের দেননি। আমি চামড়ার ব্যবসা করি আর যাই করি, এই বংশের একজন বলে আপনি আমাকে এটা দিতে চাইছেন।

তার মানে, এ-বাড়ি কিনে তোমার বিশেষ লাভ হবে না?

কে বলল সে-কথা? আমার যথেষ্ট লাভ হবে। অথচ এখানে বাস করে আপনাদের লাভ হচ্ছে না কিছু। এখানে জমির দাম

আকাশছোঁয়া। বড় বাড়ি তুললে প্রচুর লাভ।

এই লাভের কতটা আমরা পাব ?

সবাই দাবী করলে শতকরা পঁচিশ ভাগ।

বাকীটা তোমার ?

হ্যাঁ।

তাহলে দেব কেন ?

আপনি না দিলে আমি নেব না।

অন্য অনেকে তো প্রচুর দিতে চাইছে।

তারা ঠকাতেও পারে। তবে আপনি তাদের দিতে পারবেন না আমি জানি।

চামড়ার ব্যবসা করতে করতে তোমার আভিজাত্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষের দুর্বলতা ভাঙিয়ে খেতে শিখেছ। শুধরোতে চেষ্টা করো। বুঝলে ?

সত্যবিজয় চুপ করে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে অনন্তবিজয় বলে—ঠিক আছে সত্য। শুধু একটা শর্ত।

বলুন।

বাড়িটার নাম রেখো 'বিজয়-ভবন'। ওটুকুই আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে।

আপনাকে কথা দিলাম কাকা।

তাহলে সব তৈরি করে নিয়ে এসো।

আজ বুধবার। আমি রবিবারে সব কাগজপত্র নিয়ে আসব।

এত তাড়াতাড়ি ?

আপনিই বলুন তাহলে।

না না, রোববারেই এসো।

সত্যবিজয় আকাশের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। বলে—এবারে তোমরা হয়তো শান্তি পাবে।

কি জানি। তবে এখানে অনেকেই দুস্থ। আপনি যদি এই

সঙ্গে কিছু টাকা দেন তাহলে উপকার হবে।

জানি আকাশ। যতই আমি সংস্কারবর্জিত আধুনিক হই, আমার মধ্যেও রয়েছে একজন চপলাসুন্দরী—একজন অনন্তবিজয়ও।

সত্যবিজয় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সবার মনের ভেতরটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তারা যেন নিঃস্ব হয়ে গেল। এতদিন তারা এ বাড়ির দিকে একবার ভালভাবে চেয়েও দেখেনি। এখন বাড়ি ঢোকার মুখে রাস্তা থেকে এটির দিকে দেখতে দেখতে আসে। কত আপন, তাদেরই একজন বলে মনে হয়। হয়ত তাদেরই মত অতীত গৌরব রোমন্থন করতে করতে এই জীর্ণদশায় এসে পৌঁছেচে।

আকাশ একদিন বারান্দার রেলিং-এ হাত বোলাচ্ছিল, এমন সময় মন্মী এসে বলে—কি করছিস রে আকাশ।

চমকে উঠে আকাশ বলে—না, বড্ড পুরোনো হয়ে গিয়েছে। তাই দেখছিলাম।

আমাদের নতুন বাড়ির ঘরগুলো কত বড় বড় হবে?

আমাদের ওখানকার ঘর এ বাড়ির মত তো একসঙ্গে থাকবে না। ফ্ল্যাট সিস্টেম।

তবু। কত বড় হবে?

দেখিনি। তবে অনেক ছোট হবে নিশ্চয়। আমাদের এই সব ঘরে ফুটবল খেলা যায়। ওখানে ঘরে বসে লুডো খেলতে পারবি।

তা হোক।

হ্যাঁ। পুরোনোকে আগলে রেখে কোন লাভ নেই। পুরোনো তার মায়ায় যাদের ভোলাতে পারে, তাদের আর উন্নতি হয় না।

ঠিক রবিবারেই সত্যবিজয় আবার এলো। সবাই জানত সে আসবে। কারণ শনিবারের ইংরাজী আর বাংলা দৈনিকে বাড়িখানা বিক্রি হওয়ার ব্যাপারে একটা নোটিশ হয়েছিল। কল্যানী দেখে এসে বলে ছিল। আইনের ব্যাপার। ওটা দিয়ে রেখে সত্যবিজয় বাড়িটার ওপর কারও অনির্দিষ্ট কাল পরে দাবী করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

রবিবারে আকাশের সঙ্গেই নীচে প্রথম দেখা হলো সত্যবিজয়ের। সে একা আসেনি। দু তিনজন আইনজ্ঞ ও পরামর্শ দাতাকেও সঙ্গে করে এনেছে।

শনিবারের কাগজ দেখেছিলে আকাশ?

হ্যাঁ, শুনলাম।

বছরের পর বছর, এক একজন করে দাবী করলে কাজের কাজ হবে না। বাড়ি কেনা কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। ওটা রক্ষা কবচ।

আকাশ বলে—তাই মনে হলো।

কাকা কি বলেন? মত পাল্‌টাননি তো।

না। তবে কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না।

জানি। সবার জীবনই ক্ষনস্থায়ী আকাশ। কে কখন যায় কিছু বলা যায় না। এখন তবু কাকার কথা সবাই মান্য করে। ওঁর পরে তেমন থাকবে না। বাড়িটাও যাবে, কেউ টাকাও পাবে না।

জানি।

তোমারও মন খারাপ নাকি?

স্বাভাবিক। তবে কাটিয়ে উঠতে পারব।

অনন্তবিজয় খাটের ওপর বসে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সত্যবিজয়দের নিয়ে আকাশ ঘরে ঢুকতে বলে ওঠে—প্রশান্ত আর পৃথ্বীকে ডেকে নিয়ে আয়।

সবাই ছিল বাড়িতে। থাকতে বলা হয়েছিল। আকাশ তাদের ডেকে নিয়ে এলো।

সাধারণত অনন্তবিজয় ধীর স্থির—অন্তত বাইরের লোকের সামনে। কিন্তু সেই স্থিরতা অন্তর্হিত। সে বেশ চঞ্চল বলে মনে হলো। আপ্রাণ চেষ্টায় একটা কিছু চাপাতে চাইছে।

প্রশান্তবিজয়কে প্রশ্ন করে—তোমার মনে কোন ক্ষোভ নেই তো।

আমার আর কী ক্ষোভ থাকবে। পৃথিবীতে আমি একা।

অন্য সময় হলে অনন্তবিজয় হয়ত কটু কথা বলত। বুঝিয়ে দিত তার জন্যই বংশের এই দুর্গতি। কিন্তু কিছুই বলল না।

পৃথ্বীকে বলে—তুমি কি বল পৃথ্বী? কাজটা ঠিক হচ্ছে তো?

হ্যাঁ। এর চেয়ে ঠিক কাজ অনেক দিন হয়নি।

সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি। সচরাচর মিথ্যে বলিনা আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনন্তবিজয়ও বলে তাহলে আর কি। সত্যবিজয় তুমি যা করার কর।

আপনারা কয়েকটা সই করবেন। কিন্তু যেখানে গিয়ে উঠবেন জায়গাটা একবার দেখে এলে হতোনা দলিলের মধ্যে যদিও কার কোন ফ্ল্যাট নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, তবু নিজের চোখে একবার কেউ দেখে এলে আমার ভাল লাগত।

অনন্তবিজয় ক্লান্ত স্বরে বলে—নিজের চোখেই তো দেখা।

কেউ দেখেনি কাকা। কেউ যায়নি।

তুমি তো দেখেছ। তুমিও একজন 'বিজয়', ওতেই হবে। দাও সই-টই করতে হবে নাকি। ওসব পড়ে শুনিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

সবকিছু হয়ে গেলে পেছন থেকে অমরবিজয় বলে ওঠে—আমার সিগনেচার কেউ নেয় নি।

সত্যবিজয় একবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়। অনন্তবিজয়ের দিকে চায়।

হ্যাঁ। নাও ওর সই।

সুন্দরভাবে নিজের নাম সই করে অমরবিজয়।

সত্যবিজয় হেসে বলে—কেন সই করলেন, জানেন তো?

জানব না কেন? নিমতলা শ্মশানের কাষ্ঠ দোকানদাররা অর্ধ টাকার কাষ্ঠ এক টাকায় বিক্রি করে—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে। সই করে দিলাম—সরকার বাহাদুর এবারে এদিকে নজর দেবে।

সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়।

সত্যবিজয় একটু পরে বলে—আজ মাসের পনেরো তারিখ। ওমাসের পয়লা তারিখে আপনাদের এবাড়ি ছাড়তে অসুবিধা হবে?

অনন্তবিজয় শূন্য দৃষ্টিতে সবার দিকে কেমন ভাবে চাইতে চাইতে

বলে—কি আর অসুবিধা। কোন অসুবিধে নেই, তাই না পৃথ্বী?

না।

প্রশান্ত?

যেদিন বলবেন, চলে যাব।

তবে আর কি! পয়লা তারিখেই চলে যাব। এই পনেরোটা দিন কয়েকশো বছরের ভিটেতে বাস করে নেব আমরা। তাই না পৃথ্বী?

অনন্তবিজয়কে ভীষণ বিচলিত বলে মনে হয়। পৃথ্বী আর প্রশান্ত ধীরে ধীরে বার হয়ে যায়।

অমরবিজয় একটু দাঁড়িয়ে থেকে হাত উল্টে সামান্য হেসে বলে ওঠে—সাজানো বাগান শুকায়ে গেল। গিরিশটা এ্যাক্টো করে ভাল। মোদো মাতাল হলেও স্টেজে উঠলে কেমন শিব নেত্র হয়ে যায়। যাবে নাকি কাকা, থ্যাটারে? দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ আসছেন। গিরিশের এ্যাক্টো দেখবেন।

অনন্তবিজয় হাত তুলে ইশারায় অমরবিজয়কে চলে যেতে বলে।

সত্যবিজয় বলে—আমরা তাহলে আসি কাকাবাবু?

হাঁ, এসো।

সত্যবিজয় আকাশকে মৃদু কণ্ঠে সঙ্গে যেতে বলে।

নীচে নেমে সত্যবিজয় বলে—তোমার দাদু খুব 'শক্' পেয়েছেন। জানিনা কি হবে। শেষে আমার আফশোষ না হয়।

ওদের একজন বলে—এই, দিন আসতই। উনি জীবিত থেকে তবু তো দেখলেন যে পরিবারের অন্যান্যরা জলে পড়লেন না। আরও দেখলেন বাড়িটা ওঁরই এক আত্মীয়ের কাছে গেল।

হ্যাঁ। মুখে অনেক কিছু বললেও, মনে মনে তাই জানেন। এই মুখুজ্জে বংশের সবাইকে নিয়ে ওঁর হৃদয় তৈরী হয়েছে।

তবে! দুঃখ করবেন না।

সত্যবিজয় আকাশকে বলে—আকাশ তুমি কি বল। ভুল করিনি তো? এখনো আমি দলিল ছিঁড়ে ফেলতে পারি। এ যেন পুরনো মন্দির ভাঙার মত আমার মনের ওপর চেপে না বসে।

আপনি উপকারই করে'ছন আমাদের সবার। দলিল ছিঁড়বেন কেন ? আপনি ঠিক কাজ করেছেন। আমরা কেমন বন্দী হয়ে ছিলাম।

ওরা সবাই গাড়ীতে গিয়ে ওঠে। আকাশ ওদের বিদায় জানাতে গেলে সত্যবিজয় বলে—তোমার কবে সময় হবে ?

কিসের সময় !

আমি তোমাকে নিয়ে একবার ফ্ল্যাটগুলো দেখিয়ে আনতে চাই। এতটা নিস্পৃহ হওয়া ভাল নয়।

আমি নিস্পৃহ নই। তবে বড়দের ওপর কথা বলিনা।

ভাল কর। কিন্তু তুমিও ছোট নও আকাশ। আমার মনে হয় অনন্তবিজয়ের পর তুমিই—

আমি।

হ্যাঁ ওদের তিনজনকে দেখলাম। ওরা পারবে না।

কি পারবে না ?

নতুন জায়গায় গিয়ে মুখুজ্জে বংশকে নতুন করে গড়ে তুলতে।

আপনি আছেন। আপনি বাইরের কেউ নন।

না। আমিও পারব না। আমি এখন বিচ্ছিন্ন। অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত—অনেক দূরে স'রে গিয়েছি।

আমাদের আর আছে কি ! নতুন করে গড়ে তোলার মত স্বপ্ন আমিও দেখিনা। সেই সাধ্যও আমার নেই। তবে একজন পারতে পারে। সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে পারে সে।

কে ?

কল্যাণী।

কল্যাণী। চিনিনা তাকে।

পৃথ্বীবিজয়ের মেয়ে। দিগ্বিজয়দাকে চিনতেন নিশ্চয়।

তাকে শুধু আমি কেন, দেশের অনেকেই এখনো মনে রেখেছে।

তারই বোন—একই ধাতুতে গড়া। ওর শক-ট্রিটমেণ্টে মুখুজ্জে বংশের উপকার হতে পারে।

সত্যবিজয় আর কিছু বলল না। শুধু বলল—বুধবার দিন দুটো

নাগাদ রেডি থেকো আমি আসব।

সত্যবিজয় চলে গেল। আকাশ মাথা নীচু করে বৈঠকখানার পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে নারকেল কুল গাছের দিকে দৃষ্টি আঁটকে যায়। গাছটিকে দেখলে মনে হত বিগত যৌবনা—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বুঝি অনন্ত-যৌবনা। এবারও তার মধ্যে নতুন সৃষ্টির লক্ষণ পরিস্ফুট। সরস্বতী পুজো অবধি এটি কি থাকবে? আকাশ কাছে গিয়ে গাছটির গুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দেয়। সেটির কাছ থেকে সরে যায় চাঁপা ফুল গাছের কাছে। স্মৃতিতে ঃস্মৃতিতে মাখামাখি সব গাছ, সব জায়গা। দিগ্বিজদার ফটোতে অমন তাজা চাঁপা ফুলের পুষ্পাঞ্জলি আর কখনোই দেওয়া হবে না। ওদিকে শিউলি গাছ। এবারও ফুল দিয়েছে। গাছের নীচে বিছিয়ে দিয়েছিলো সাদা আর হলুদ মেশানো আস্তরণ মন ভরিয়ে দিয়েছে—গন্ধে সৌন্দর্য্য। আর থাকবে না। সারা কলকাতা থেকেই লুপ্ত হতে বসেছে এরা—এই একান্ত চেনা রূপ রঙ আর রস। চাঁপা নেই, শিউলি নেই। এবার আর থাকবে না।

এরা থাকবে না। এ বাড়িও ভূমিসাৎ হবে। তখন এ-বাড়ির সবাই বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা।

অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আকাশবিজয় পাতালের সেই ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আজ আর শকুন্তলা-অচ্যুতকে ওখানে দেখার সংকোচ নেই। নিজেদের কাছে পাওয়ার জন্যে ওদের লুকোচুরির দরকার নেই। আকাশ ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে থাকে। আজ ওদের বদলে ইন্দ্রবিজয়ের সাক্ষ্যাৎ মিলতে পারে। আকাশকে দেখে ধমকাতে পারে। কিংবা সবাই বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। মা কিছুদিন আগেও ইন্দ্রবিজয়কে ঘুরে বেড়াতে দেখত। আজ থেকে বাকী পনেরো দিন আর দেখার সম্ভাবনা নেই। তারপর এক দিন ইন্দ্রবিজয়ের আত্মা চাঁপা গাছ নারকেল কুল গাছ আর শিউলি গাছের ডাল ভেঙে দিয়ে চলে যাবে। আত্মার সদ্গতি হবে।

কিন্তু নীচের ঘরে নেমে আকাশ দেখে ইন্দ্রবিজয় নেই, ঘর শূন্য।

তবু আছে ইন্দ্রবিজয়—তার শেষ আশ্রয়স্থল ছিল এই প্রকোষ্ঠ। তবু আছে দিগ্বিজয় এই ঘরে—তার রক্ত ঝরেছিল এখানে। সেদিন ইন্দ্রবিজয় দিগ্বিজয়কে অনেকক্ষণ আগলে রেখেছিল। নইলে অত বড় ফৌজের বিরুদ্ধে ওভাবে লড়লো কি করে অতক্ষণ ধরে ?

পায়ের শব্দশুনে আকাশ চমকে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে কল্যাণী।

তুই ?

তুমি ?

আমি এসেছিলাম দেখতে, ইন্দ্রবিজয়ের সাক্ষ্যাৎ পাওয়া যায় কিনা। এতদিনের বাড়িটা ধ্বংস হতে বসেছে। তাঁর কিছু বক্তব্য থাকতে পারে।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কল্যাণী বলে—তুমি বিশ্বাস করো।

জানি না। কল্পনা করতে খুব ভালবাসি নিশ্চয়। তাই কল্পনা আর বাস্তব এক এক সময় একাকার হয়ে যায়। কিন্তু তুই কেন এলি ?

আমি এসেছিলাম তীর্থক্ষেত্রে।

তীর্থক্ষেত্র আবার কিসের ? তুই ও-সবে বিশ্বাস করিস ?

এ তীর্থক্ষেত্র—তোমাদের তীর্থক্ষেত্র নয়, আকাশদা। তোমাদের ভগবানের স্পর্শ পাও কিনা জানিনা, এখানে এলে আমি দাদার স্পর্শ পাই। প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। আমি এখানে প্রায়ই আসি। তোমরা জানতে না।

জানা উচিত ছিল।

কল্যাণী আপন মনে বলে চলে—এটা আর থাকবে না। এর অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তুমি আমার চেয়ে ভাল জান আকাশদা, আমার দাদা কি কোন শহীদের চেয়ে কম—যাঁরা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন।

আমি অন্য শহীদদের দেখিনি। তাঁদের সম্বন্ধে পড়েছি শুধু। দিগ্বিজয়দাকে আমি নিজের চোখে দেখেছি। দিগ্বিজয়দার চেয়ে বড় শহীদ ছিলেন কিনা আমি কল্পনা করতে পারিনা, করতে চাই না।

তবু দেখ আকাশদা, অন্য অনেক জায়গার মত এই ঘরটিকে

সংরক্ষিত করা হবে না। এটি হারিয়ে যাবে।

কল্যাণীর মুখ থমথমে। তার চোখের দৃষ্টি কোন বিশেষ দিকে নিবদ্ধ নয়—অথচ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

কল্যাণীর অনুভূতি আকাশকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না।

ঘরটি আগে চেয়ার টেবিলে সাজানো ছিল। দেয়ালের গায়ে আলমারী ছিল। তাতে সাজানো থাকত মদের বোতল। সে সব আলমারী অযত্নে খসে খসে পড়ছে। আসবাব পত্রও নেই। রয়েছে ছটি জলচৌকি—তাও ধূলিমলিন। দিগ্বিজয়রা হয়ত ব্যবহার করত।

জলচৌকি ছটো পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশ বলে—বোস্ কল্যাণী।

কল্যাণী বসে। ওরা ছজন কেউ কোন কথা বলে না। তবু কত কথা হয় যেন। একই চিন্তায় তন্ময় ছজনা।

ওপর থেকে আর একজন কে নামছে এই ঘরে। খুব সাবধানে নামছে। পা টিপে টিপে।

ওরা ছজনা উৎকর্ণ হয়। শব্দ এগিয়ে আসছে।

মরমী! হাতে একটা শাড়ি।

তোরা?

মরমীর কণ্ঠস্বর আর্তনাদ করে ওঠে যেন। ওর চোখ ছটো কিসের দুঃস্বপ্ন দেখছে? এ কোন্ মরমী? একে ওরা ছজনার কেউ চেনেনা। ছজনাই নিমেষে জলচৌকি ছেড়ে উঠে মরমীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

তোর কি হয়েছে মরমী? এমন দেখাচ্ছে কেন?

মরমী মেঝের ওপর বসে পড়ে ছহাতে মুখ ঢাকে। হাতের শাড়ি হাত থেকে পড়ে যায়।

কল্যাণী সেটা তুলে নিয়ে দেখে মরমীরই আর একখানা শাড়ি, যেটা একটু ভাল। অনন্তবিজয়ের ঘরে বাইরের লোকজন এলে সেটা পরে ফেলে।

মরমী!

একটু পরেই শান্ত হয় মরমী। বলে,—আমি এসেছিলাম—সুচিত্রা কাকীর মত শোবার ঘরের ভেতরে ঝুলতে খারাপ লাগে।

মরমী!

চুপ কর আকাশ। এখানে বংশের মৃত্যুর একটা ধারাবাহিকতা আছে। তাই এসেছিলাম। তোরা দিলি না। এখানে কত সহজ ছিল।

তুই মরতে চাস্?

চেয়েছিলাম। কী হবে বেঁচে থেকে। তুই বলতিস আমি 'ছোট চপলা'। ভুল বলতিস না। এ-বাড়ি চলে গেলে, চপলসুন্দরী থাকতে পারে? নতুন জায়গায় আমি কোন্ পরিচয়ে থাকব?

কল্যাণী কাটা কাটা ভাবে বলে—কেন? মরমী—এই পরিচয়ে।

কল্যাণীর দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মরমী বলে,—তুই অনেক ছোট। অনেক কিছু জানলেও সব জানিস না। মরমী কোন পরিচয় নয়। বড় জোর হতে পারে, পাগলের মেয়ে। ঘুঁটে কুড়ানী!

নিজেকে তুমি এত ছোট ভাব মরমীদি!

আকাশ তাড়াতাড়ি বলে—ওসব চিন্তা ছেড়ে দে। তুই আর সুচিত্রা কাকী এক নয়। এতদিন দেখা না গেলেও এখন তোর একটা ভবিষ্যৎ দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া তোকে আমিই তোর শ্বশুর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমাকে না বলে তুই এভাবে চলে যেতে চেয়েছিলি? তুই বিশ্বাসঘাতক, তুই কৃতঘ্ন।

মরমী এবারে অঝরে কাঁদে। ওরা দুজনা ওকে কাঁদতে দেয়।

মরমী উঠে দাঁড়িয়ে বলে,—ঠিক আছে। তোকে না বলে মরব না।

তোরা কিছু টাকা পাবি মরমী। সত্যবিজয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সবাই পাবে কিছু কিছু। তুই যাতে বেশী পাস্ সেই চেষ্টা করব। মনে হয়, বুঝিয়ে বললে সত্যবিজয় দিয়ে দেবেন। ওটা নতুন জায়গা। তোকে ওখানে গিয়ে বংশ ধুয়ে জল খেতে হবে না। যা পারিস করবি। আমরা তো সবাই থাকব পাশাপাশি—শুধু আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে।

ওরা ওপরে উঠে আসে।

কলকাতার ভেতর থেকে শিউলি-ঝরা আর একখণ্ড একান্ত জায়গা মুছে যাবে। অগ্নিজেন তৈরীর আর একটি কুটির শিল্প নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ওরা তিনজনে বাইরের বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে যায়। সেই সময় দেখতে পায় মরমীর মা ব্যস্ত হয়ে নীচে নেমে আসছে। মরমীর মাকে কখনো নীচে দেখা যায় না। পূজো-পার্বনেও নয়। মরমীর বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

সে ছুটে বার হয়ে আসে। বলে—বাবার কিছু হয়েছে আকাশ।

আকাশ আর কল্যাণীও ছুটে যায়।

মরমীর মা বলে—তোরা এখানে। সবাই যে খুঁজছে আকাশকে।

আবার কি হলো?

তোমার দাদু হঠাৎ কেমন করছেন। তোমার নাম ধরে ডেকে ছিলেন। কল্যাণীর বাবা ডাক্তার আনতে গিয়েছে।

ওরা তিনজনে অনন্তবিজয়ের ঘরে গিয়ে ঢোকে। দেখে অনন্তবিজয় চুপচাপ পড়ে রয়েছে।

প্রশান্তবিজয় বলে—তোর নাম বারবার করছিলেন।

এখন কেমন আছেন?

একটু আগেও ছট্‌ফট্ করছিলেন। বুকে ব্যথা।

হ্যাঁ, অম্বলের ব্যাথা। এ্যাণ্টাসিড এনে দিয়েছি।

ডাক্তার আসুক। দেখুক।

আকাশ বিরক্ত হয়। তাড়াতাড়ি দাদুর দিকে এগিয়ে যায়। পাশে গিয়ে বসে।

গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—দাদু।

দাদু কথা বলেন না।

সেই সময় পৃথ্বীবিজয় ডাক্তারকে নিয়ে আসে।

ডাক্তার অনন্তবিজয়ের চোখের পাতা টানে পাল্‌স্ দেখে।

বুকে স্টেথোস্কোপ বসায়।

তারপর বলে,—ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক।

আকাশ বলে—উনি তো স্থির হয়ে আছেন। নড়ছেন না।

হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গেই মারা গিয়েছেন।

আকাশবিজয় ছিট্‌কে একটু দূরে সরে যায়। একটা চাপা আর্তনাদ শোনে। হয়ত কোন একজনের কণ্ঠনিঃসৃত আর্তনাদ সেটি নয়—সবার মিলিত আর্তনাদ। বহুদিন পরে সে নিজের মাকে কাছে চায়: মা নেই ঘরে।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখে মা বসে কাঁদছে। মা জানত আকাশের বড় ইচ্ছে হয় মায়ের বুকে মুখ লুকোয়। আবার তার ইচ্ছে হয় ছোট্ট মেয়েকে সান্ত্বনা দেবার মত মাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হবে। ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হবে।

সে দাদুর ঘরে গিয়ে দেখে ডাক্তার কি লিখছেন।

পৃথ্বীবিজয় বলে—মায়ের কাছে যাও।

ভিজিট।

মাথা ঘামিও না। আমি সব দেখছি।

আকাশ দাদুর দিকে চায়।

স্থির অচঞ্চল। কোন কিছুই আর তার দাদুকে বিচলিত করতে পারবে না। তার প্রগাঢ় বংশমর্যাদাবোধে কেউ আর কখনো আঘাত দিতে পারবে না। আর্থিক অনটন আর আভিজাত্যহানির ভয়ে সমস্ত পৃথিবী থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসে এই চারদেওয়ালের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রেখেছিল। সেই বন্দী অবস্থায় জ্বালা আর অসহায়তা তার চোখ মুখ দিয়ে অবিরত ফুটে বার হতো। এখন দাদু মুক্তি পেয়েছে। এখন দাদুর অন্তরে নিবিড় শান্তি। সেই শান্তি তার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত।

দাদু তার জেদ ঠিক বজায় রাখলো। কেউ তাকে এ-বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারল না।

আকাশ এক সময় চেয়ে দেখে ডাক্তার কখন চলে গিয়েছে। ঘরে কেউ নেই। শুধু তার দুহাত ধরে দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মরমী আর কল্যানী। মুখুজ্জেবংশের শেষ প্রজন্মের তিনটি প্রানী।

—•—